একটি নাটক নিয়ে

একটি নাটক নিয়ে

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীবকুমার মজুমদাব
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দিলীপ দাস

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৬৮

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া জয়ন্তী ও

বিপুলকান্তি চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু—

মিস্টার ঘোষাল তাঁর লিভিং-রুমে বসে বই পড়ছিলেন। নিস্তব্ধ রাত। শুধু একটা ঘড়ি টক-টক করে তার অস্তিত্ব জানাচ্ছিল। বাড়িটা ঘুমিয়ে পড়লেও ঘড়িটা জেগে পাহারা দিচ্ছে। এতক্ষণ যেন সাহস দিচ্ছিল ঘোষাল সাহেবকে। এইবারে চমকে দিল। জলতরঙ্গের মতো টুং-টাং করে খানিকক্ষণ বাজবার পরে ঢং-ঢং করে বাজতে শুরু করল।

চোখের উপর থেকে বইখানা নামিয়ে ঘোষাল সাহেব ঘড়ির দিকে তাকালেন। এ কি! ঘড়ির একটা কাঁটা কেন! চোখ দুটো রগড়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। কাঁটা একটাই মনে হচ্ছে। ছোট বড় দুটো কাঁটাই এখন বারোটার ঘরে মিশে আছে। বইখানা সোফার হাতলে উলটে রেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। উদ্বিগ্নভাবে তাকালেন দরজার দিকে। তারপর ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

না, দরোয়ান এখনও ঘুমোয় নি। গেটের তালা দেয় নি এখনও। গ্যারেজের দরজাও খোলা আছে। বেয়ারা লতিফও হয়তো কাছেই অপেক্ষা করছে। আর কতক্ষণ এদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে!

বাইরের জোরালো বাতিটা জ্বলছিল। সেই আলোয় ঘোষাল সাহেব বাগানের অনেকখানি দেখতে পেলেন। বোধহয় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই জল ক্যাক্টাসের কাঁটার উপরে চকচক করছে, আর টলমল করছে ক্যালেডিয়ামের পাতায়। সাহেব বাড়ির

মালী এই সব গাছকে মনসা আর বাহারে কচু বলে না, এতে নাকি এই সব গাছের জাত যায়। আরও নানা রকমের বাহারে পাতার গাছ দেখা যাচ্ছে—উঁচু ড্রেসিলা আর নীচু ডায়াফেনবেচিয়া, প্যানাক্স, এরেনিয়া আর লাইকপডিয়াম, গ্র্যাণ্ড মাদার্স টাঙ্। পোর্টিকোয় একটা ছায়া দুলছিল। ঘোষাল সাহেব মাথা উঁচু করে দেখলেন যে সে একটা ঝোলানো অর্কিডের ছায়া। ক্যাটেলিয়ায় এখন ফুল নেই। শিরশিরে হাওয়ায় শুধু কয়েকটা ডাঁটা দুলছে।

ঘোষাল সাহেব বাগানের আর এক ধারে তাকালেন। সেদিকে নানা জাতের দেশী ফুল ফুটেছে। কয়েক রকমের জবা, যুঁই আর স্বর্ণ চামেলি। এক থোকা রজনীগন্ধাও দেখতে পেলেন। একটু যেন দুলছে।

ব্যস্তভাবে তিনি খোলা বারান্দায় পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। কিন্তু রাস্তায় কোন গাড়ির শব্দ পেলেন না। কলকাতার এই পথে এখন আর গাড়ি চলছে না, পথটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এই পাড়া পুরনো বাসিন্দের পাড়া। এ পাড়ার মানুষ অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু তাঁর বাইশ বছরের কুমারী কন্যা এখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকালের নিয়ম সে নির্দয় হাতে ভঙ্গ করেছে। শুধু এই বাড়ির নয়, এই পাড়ার পুরনো মানুষদের, পুরনো সমাজের নিয়ম। এটা নাকি এ যুগেরই নিয়ম। নিয়ম বলে কিছু থাকবে না। নিয়ম ভঙ্গ করাই নাকি এখন সাহসের পরিচয়। এ যুগে প্রগতির মানেই হল পুরনো সব নিয়মকে বাতিল করে দেওয়া। নিজেদের কালে ঘোষাল সাহেবরা যে নিয়মানুবর্তিতার শ্রদ্ধা করেছেন এবং এখনও যা রক্ষার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, তা রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় বলে এ কালে ঘৃণিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘোষাল সাহেব এক প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত হয়ে গেছেন। ঘোষাল সাহেবকে তাই তাঁর কথায় ও কাজে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়।

ঘোষাল সাহেবের আর একটি দুর্বলতা আছে, তার জন্যেই তিনি মেয়েকে বাধা দিতে পারেন না। শাশ্বতী তাঁর শেষ বয়সের সন্তান। জন্মের পরেই মাতৃহীন হয়েছে। তাই তিনি মায়ের স্নেহ দিয়েই মানুষ করেছেন মেয়েকে। মায়ের মতো কোমল তাঁর হৃদয়। তাই পিতার কর্তব্য পালনে ত্রুটি হয়েছে চিরকাল। মেয়েকে কোন দিন শাসন করতে পারেন নি। নিয়ম শিথিল হয়েছে তাঁর, নিয়ম ভঙ্গ করেছে মেয়ে। বাধা দেওয়া উচিত ভেবেও কঠিন ভাবে বাধা দিতে পারেন নি।

দু' বছর আগে বিদেশ থেকে অবসর নিয়ে যখন দেশে ফিরলেন, তখনই তিনি প্রথম এর জন্য আপসোস করলেন তাঁর পুরনো বন্ধু হীরেন বাবুর কাছে। বছর খানেকের বড় এই বৃদ্ধ অধ্যাপক সব শুনে বললেন ঃ সতর্ক হবার এখনও সময় আছে।

ঘোষাল সাহেব বলেছিলেন ঃ চিরকালই আমি সতর্ক।

অধ্যাপক বলেছিলেন ঃ সে যে মনে মনে তা আমি মানি। আমি কাজে সতর্ক হবার কথা বলছি।

এর পরে অনেক আলোচনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। সে সমস্ত কথাও তাঁর মনে পড়ে গেল। হীরেনবাবু বলেছিলেন ঃ মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে তোমার কর্তব্য তা নিশ্চয়ই বোঝ।

ঘোষাল সাহেব নিঃশব্দে এ কথা মেনে নিয়েছিলেন।

হীরেনবাবু বলেছিলেন ঃ দু'দিন পরেই হয়তো মেয়ের বিয়ে দেবে, কিন্তু বিয়ের পরেও যে তোমার মেয়ের এই স্বভাব বদলাবে তা মনে হয় না। সে এই ভাবেই চলবে, এই রকম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে।

উদ্বিগ্নভাবে ঘোষাল সাহেব প্রশ্ন করেছিলেন ঃ তুমি কি কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছ ?

সমূহ বিপদের আশঙ্কা। বাপ বলে মেয়ের সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করতে পার, কিন্তু স্বামীর পক্ষে সব সময় তা সম্ভব নয়। সে তার বউকে গৃহিণী দেখতে চাইবে, আর সে ভাবে না পেলে—

বুঝেছি।

বুঝেছ তো। সেই জন্যেই বলছি যে মেয়েকে এখনই সতর্ক করে দাও। তার ভবিষ্যতের জন্যেই এটা দরকার। সে জানুক যে এই রকমের স্বাধীন জীবন বিবাহের পরে আর শোভন হবে না, বিবাহের আগেও হচ্ছে না।

ঘোষাল সাহেব সেদিন হীরেনবাবুর কথা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বলি-বলি করেও মেয়েকে কিছু বলতে পারেন নি। সবাই তো তাঁকে রক্ষণশীল বলে। অন্ততঃ সমাজে তাঁর এই পরিচয় সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ। তিনি বিশ্বাস করেন যে মেয়ের চলাফেরায় কোন বিধিনিষেধ আরোপ করলে মেয়েও তাঁকে ক্ষমা করবে না। শখ করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন শাশ্বতী। এখন দেখছেন যে নামটা মিথ্যা হয়ে গেছে। কালো মেয়ের নাম রাখা হয়েছে গৌরী।

শাশ্বতী কোথায় গিয়েছিল ঘোষাল সাহেব তা জানেন, কিন্তু এখন কোথায় আছে তা জানেন না। অন্য দিন তার এত দেরি হয় না। রাত দশটা পর্যন্ত ঘোষাল সাহেব ডিনার খেতে বসেন নি। ধৈর্য সহকারে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। তারপর টেলিফোন করে খবর পেয়েছিলেন যে ক্লাবে সে এখন নেই। ঘণ্টাখানেক আগেই তারা যে যার মতো ফিরে গেছে।

মনে মনে হিসেব করে ঘোষাল সাহেব বুঝতে পারলেন যে এক ঘণ্টা অনেক সময়। টুমরো ক্লাব থেকে গাড়ি নিয়ে বেরোলে বাড়ি পৌঁছতে পনের মিনিটের বেশি লাগবে না। রাস্তায় ভিড় থাকলে দু' চার মিনিট বেশি লাগতে পারে, আর পথে গাড়ি ঘোড়া আটকে গিয়ে থাকলেও এক ঘণ্টা কিছুতেই লাগবে না।

ঘোষাল সাহেব আর অপেক্ষা না করে ডিনার খেয়ে নিয়েছিলেন। তারপরে লিভিং-রুমে বসে একখানা বাংলা বই পড়ছিলেন—হিমালয় ও সাধু সঙ্গ। হীরেনবাবুই বইখানা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ বয়সে পড়বার উপযোগী বই। পড়ে আনন্দ পাবে। আনন্দর জন্যেই তো পড়া।

ঘোষাল সাহেব জানেন যে হীরেনবাবুর একটু বাড়াবাড়ি থাকলেও অনেক কথা ঠিক বলেন। অন্ততঃ এই বই পড়ার ব্যাপারে ঠিকই বলেছিলেন। বইখানা সত্যিই ভাল। বেশ তন্ময় হয়ে পড়ছিলেন। এগারোটা কখন বেজে গিয়েছিল বুঝতেই পারেন নি। বারোটার বাজনায় তাঁর খেয়াল হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে বেজেছে বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তা না হলে প্রতি পনের মিনিটেই তো টুং-টাং করে বেজেছিল।

ঘোষাল সাহেব আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন, সেই কথাই ভাবছিলেন। তাঁরও বয়স হয়েছে, বিশ্রামের প্রয়োজন আছে তাঁরও। কিন্তু মেয়ে সে কথা বোঝে না। আর বুঝবেই বা কী করে। তিনি তো সামনে থাকেন না। মেয়ের সাড়া পেলেই পালিয়ে যান আড়ালে। বুঝতে দিতে চান না যে তিনি অধীর হয়ে মেয়ের জন্যে জেগে থাকেন।

ঠিক এই সময়েই গেটের কাছে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। বোধহয় নিঃশব্দেই এসেছিল। কিন্তু গেট বন্ধ ছিল বলে দাঁড়িয়ে গেল। পিছনে আরও একখানা গাড়ির শব্দ পেলেন ঘোষাল সাহেব। তিনি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না, নিঃশব্দে পালিয়ে উপরে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। আর অন্ধকার ঘরের দরজা দিলেন ভেজিয়ে। দরোয়ান যে লাফিয়ে গিয়ে গেট খুলে দিল, ঘোষাল সাহেব সে শব্দও শুনতে পেলেন। শাশ্বতীর গাড়ি গ্যারেজের দিকে চলে গেল! অন্য গাড়িটা বাইরে থেকেই ফিরে গেল বলে মনে হল।

বেয়ারা লতিফ কোথায় ঘুমোচ্ছিল সেই জানে। গাড়ির শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে সামনের বারান্দায় এল ছুটে। কিন্তু তখনও তার দরকার হয় নি। গ্যারেজে গাড়ি রাখবার পরে দরজা বন্ধ করবে দরোয়ান, শাশ্বতীকে বারান্দায় পৌঁছে দিয়ে যাবে। তখন লতিফের কাজ। জিনিসপত্র সঙ্গে থাকলে দরোয়ানের হাত থেকে নিয়ে শাশ্বতীর ঘরে পৌঁছে দেবে। না খেয়ে এলে খাবার ঘরে নিয়ে

আসবে। আর খেতে না চাইলে জিজ্ঞাসা করবে, সুইট ডিশ? এ কথার উত্তরে শাশ্বতী হয়তো বলবে, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

লতিফ জানে যে এক গ্লাস ফ্রিজের জল দিতে হবে। না চাইলেও সে দেবে। তার জলটা খেলে আর এক গ্লাস রেখে যাবে বেড সাইড টেবলে। তারপরে রিডিং-রুমের দরজা বন্ধ করবে। বাতি নেভাবে ঘরের ও সিঁড়ির। একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে তার ছুটি হবে। তাই যেমন করে রোজ আসে, তেমনি করে আজও সে এগিয়ে এল।

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করল: বাবা শুয়ে পড়েছেন তো লতিফ?

ঘোষাল সাহেবের উদ্বেগ লতিফ সবই দেখেছিল। তাঁকে টেলিফোন করতেও দেখেছিল। এও দেখেছিল যে সাহেব তার কাছেও গোপন রাখতে চেয়েছিলেন নিজের মনের দুর্বলতা। সম্ভব হলে গোপন রাখতেন। লতিফ সব দেখে ফেলেছে বলে তিনি লজ্জাও পেয়েছিলেন। তবু সে শাশ্বতীর প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানে না। এতক্ষণ সে ঘুমোচ্ছিল। সাহেব কতক্ষণ বই পড়েছেন, আর এখন কী করছেন, তা তার জানা ছিল না। তাই সে কোন গোলমেলে উত্তর না দিয়ে বলল: হ্যাঁ।

নিশ্চিন্ত হল শাশ্বতী। বলল: আমার দেরি হলে বাবাকে সময় মতো খাইয়ে শুইয়ে দেবে।

আচ্ছা।

বলে লতিফ তাকে অনুসরণ করছিল। শাশ্বতী বলল: শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।

বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

লতিফ সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে দেখল, শাশ্বতীর পা একটু টলছে। সে বেশ সাবধানে পা ফেলে ফেলে উপরে উঠছে। লতিফ তার পিছনে উঠবে কিনা একবার ভাবল। তারপর ভাবল যে তা উচিত হবে না। শাশ্বতী বুঝতে পারলে অসন্তুষ্ট হবে। তবু যতক্ষণ তাকে

দেখা যায় ততক্ষণ সে তার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যখন বুঝতে পারল যে সে উপরের বারান্দায় পৌঁছে গেছে, তখনই নিশ্চিন্ত হয়ে খাবার ঘরে ঢুকল ঠাণ্ডা জলের জন্যে।

শাশ্বতী এক মুহূর্ত দাঁড়াল ঘোষাল সাহেবের বন্ধ দরজার সামনে। অন্ধকার ঘর। ভিতরে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। পড়বেনই তো। বয়স হয়েছে, শরীর শ্রান্ত হয় তাড়াতাড়ি। বিশ্রামের প্রয়োজনও তাঁর বেশি।

এগিয়ে যেতে যেতে শাশ্বতী ভাবল যে তিনি বেশ বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ যুগটাকে পছন্দ না করলেও তিনি বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। এ যুগের সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ সংঘম নেই। থাকলে শাশ্বতীর খুবই অসুবিধা হত। এই উদার মনোভাবের জন্য মনে মনে শাশ্বতী তার পিতাকে ধন্যবাদ দিল। তারপরে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরে নাইট ল্যাম্প জ্বলছিল। শাশ্বতী একটা ছোট বাতি জ্বালল। লতিফ জল আনার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করা যাবে না। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলল ছোট সোফাটার উপরে। ওধারের দেওয়ালে ড্রেসিং-টেবলের আয়নায় দেখতে পেল যে ব্যাগটা ঠিক জায়গাতেই পোঁচেছে। লম্বা তিন কাচের আয়না। তাই ঘরের চারিধারের দৃশ্য দেখবার কোন অসুবিধা হয় না। নিজেকেও সে নানাভাবে দেখতে পায়। অনেক সময় ভালও লাগে দেখতে। মাঝে মাঝে গর্ববোধ হয় তাকে দেখবার জন্য পুরুষের আগ্রহের কথা ভেবে। অনেককেই তার হ্যাংলা মনে হয়। লোভের জিনিস যেন আর কিছু নেই।

আয়নার দিকে চেয়ে শাশ্বতী বেশ ঘৃণায় তার ঠোঁট ওলটাল। কিন্তু মনে হল, এক রকমের আত্মপ্রসাদ লেগে আছে তার ওষ্ঠাধরে। শাশ্বতীর নিজের চোখেই যেন তা ধরা পড়ে গেল।

খোলা দরজার কপাটে টক-টক করে টোকা দিল লতিফ।

ভিতর থেকে শাশ্বতী বলল : এস।

ছোট একখানা ট্রের উপরে দু' গ্লাস জল নিয়ে লতিফ ঘরে ঢুকল।

শাশ্বতী এগিয়ে গিয়ে এক গ্লাস জল তুলে নিল। চুমুক দিয়ে শেষ করল অর্ধেক। তারপর ট্রের উপর নামিয়ে রাখল। লতিফ অন্য গ্লাসটি বেড সাইড টেবলে ঢেকে রেখে চলে গেল। যাবার সময় খোলা দরজাও ভেজিয়ে দিয়ে গেল। ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিল শাশ্বতী।

শাশ্বতী এবারে তার ড্রেসিং-টেবলের আয়নার সামনে চলে এল। পা থেকে মাথা অবধি দেখা যাচ্ছে না। সামনের টুলটা তাই সে পা দিয়ে সরিয়ে দিল। হ্যাঁ, এখন তাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। তার পায়ের ডগা থেকে মাথার খোঁপা পর্যন্ত। সূক্ষ্ম শিফন তার দেহটাকে বেশি আবৃত করতে পারে নি। ব্লাউজটা আরো ছোট করা চলত। আর সম্পূর্ণ নিরাভরণ বলে মন্দ লাগছে না। সুজিত মিথ্যা বলে নি। কিন্তু এত বেশি ফ্রাঙ্ক হওয়া ভাল নয়। অবশ্য এ কথা সে পাঁচজনের সামনে বলে নি, বলেছে একান্তে নিভৃতে।

ঘটনাটা শাশ্বতীর মনে পড়ে গেল। ডিনারের টেবলে তার আঁচলটা খসে পড়েছিল। লুটোচ্ছিল মাটিতে। শাশ্বতী অনেকক্ষণ তা বুঝতে পারে নি। চারিদিকের লুব্ধ দৃষ্টি দেখেছিল সুজিত বাসু। যতক্ষণ সে একা দেখছিল, ততক্ষণ তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু অন্যের দৃষ্টি পড়েছে দেখতে পেয়েই সে তার আঁচলটা নীচে থেকে কুড়িয়ে শাশ্বতীর হাতে দিয়েছিল। শাশ্বতী তা তুলে দিয়েছিল বুকের উপরে। সুজিত অত্যন্ত সন্তর্পণে বলেছিল, একদিন তোমার বাথরুমে লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

হাউ সিলি।

বলে শাশ্বতী ধমক দিয়েছিল তাকে।

সুজিত একটুও লজ্জা পায় নি, কিছু মনেই করে নি সে। বলেছিল, এ আমার কথা নয়। এ কথা লিখেছে জার্মানির এক লেখিকা।

ভিকি বাম?

ঐ রকমের নামই হবে।

কী লিখেছিল?

তার নায়ক একদিন এমন এক জায়গায় লুকিয়ে ছিল যে—

বাধা দিয়ে শাশ্বতী বলেছিল : থাক আর বলতে হবে না।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করেছিল : বইটার নাম তোমার মনে আছে ?

ভুলে গেছি।

গ্র্যাণ্ড হোটেল নয় তো ?

সুজিত বাসুকে একটু অপ্রতিভ দেখাল, বলল : ঐ দৃশ্যটা পড়বার জন্যেই বইটা একজন আমায় দিয়েছিল। সীরিয়াস্‌লি কিছু মনে রাখার চেষ্টা আমি করি নি।

তারপরেই বলল : এই যে তোমার সঙ্গে আজ কথা কইছি, এর সব কথাই হয়তো ভুলে যাব। শুধু একটা ইচ্ছেই জেগে থাকবে, আর সেই ইচ্ছে—

শাশ্বতী এই ইচ্ছার কথা জানে। অনেক দিন অনেক ভাবে শুনেছে সুজিতের মুখে। কিন্তু এর বেশি তাকে প্রশ্রয় দিতে চায় নি।

শাশ্বতী এবারে শুতে যাবে। তার আগে নিজেকে আর একবার সে দেখবে। ঘরের বড় বাতিটা সে জ্বেলে দিল। দিনের মতো আলো হয়েছে এখন। এই আলোয় সে নিজেকে দেখবে। পুরুষরা যেমন করে তাকে দেখে, ঠিক তেমনি করে। বিবস্ত্র হলে কি তাকে আরও ভাল দেখাবে !

শাশ্বতীর হাসি পেল এইবার। সেও কি সুজিতের মত ভাবছে নাকি ! সব পুরুষই কি সুজিতের মতো ভাবে। তাদের দৃষ্টি দেখে একই কথা মনে হয়। বাইরের আবরণ ভেদ করে তারা যেন ভিতরটা দেখতে চায়। এ তাদের কী রকম শখ ! বন্য। বন্য হয়ে যাচ্ছে পুরুষগুলো। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের নামে তারা যে বনমানুষ হয়ে যাচ্ছে, সে খেয়াল তাদের নেই।

শাশ্বতী বড় বাতিটা নিবিয়ে দিল। জামাকাপড় ছেড়ে নাইটি পরে নিল তাড়াতাড়ি। তারপরে মুখে হাতে ঠাণ্ডা জল দিয়ে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়ল।

* * *

ঘোষাল সাহেব চিরকাল দেরিতে ঘুম থেকে উঠতেন, শুতে যেতেনও দেরিতে। ডিনারের টেবলে বসবার আগে অনেকক্ষণ ধরে তিনি মদ্যপান করতেন। বাড়ির সবাইকে তখন জেগে থাকতে হত। তাঁর স্ত্রীও জেগে থাকতেন। বিরক্ত হতেন। এক একদিন এর জন্যে তাঁকে স্ত্রীর কাছে অনুযোগ শুনতে হত। কিন্তু সে সব কথায় তিনি কান দিতেন না। রাতে দেরিতে খেয়ে শুতেন দেরিতে, আর সকাল বেলায় উঠতেন আরও দেরিতে। বেড টী খেয়েও আর একবার ঘুমিয়ে নিতেন।

তাঁর স্ত্রীর ভোরবেলায় ওঠার অভ্যাস ছিল। স্নান করতেন ভোরে, আর একটু জপতপ করে নিতেন আড়ালে। এটুকু না করে তিনি জলস্পর্শ করতেন না। ঘোষাল সাহেব তখন একে সময়ের অপব্যবহার বলতেন। কিন্তু নিজে তখন ঘুমিয়ে থাকতেন বলে বাধা দেবার সুযোগ পেতেন না। কোন দিন এ কথা উঠে পড়লে সেই মহিলা বলতেন: তুমি ফরেন সার্ভিসের অফিসার হতে পার, কিন্তু আমি বামুনের মেয়ে, বামুনের বউ। আমাকে তোমার ম্লেচ্ছপনা শিখিও না।

ঘোষাল সাহেব এ কথা মানতেন না। পূজো আর্চায় বাধা না দিলেও খানিকটা ম্লেচ্ছপনা বাড়িতে ঢুকিয়েছিলেন। মহম্মদ লতিফ বেয়ারা হয়ে ঢুকেছিল তাঁর স্ত্রীর আমলেই, কিন্তু বাবুর্চি ছিল নবকেষ্ট। মিসেস ঘোষাল নিজেও দু' একটা পদ রোজ রাঁধতেন। বলতেন: এটা মেয়েদের ধর্ম। স্বামীকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতে হয়। যেমন দেবতার ভোগ রাঁধতে হয় নিজেকে।

এ সব কথা শুনে ঘোষাল সাহেব তখন হাসতেন। বলতেন: পণ্ডিত বামুনের বংশে যে জন্ম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিসেস ঘোষাল আরও একটা কথা বলতেন: যতই সাহেবিয়ানা কর, নিজের ধর্মটা নিজেরই। ওটার অপমান কর না।

স্বামীকে তিনি ত্রিসন্ধ্যা জপ করাতে পারেন নি। কিন্তু দু'বার

জপ করিয়ে ছাড়তেন। সকালে স্নানের পরে গরদের কাপড় পরিয়ে দু' মিনিট কম্বলের আসনে বসতে বাধ্য করতেন। বলতেন, একসঙ্গেই দু'বার জপ করে নাও, সকালের আর দুপুরের জপ। রিটায়ার করবার পর ত্রিসন্ধ্যা জপ কর।

ঘোষাল সাহেবের বয়স তখন কম ছিল। বলতেন: এই ভণ্ডামি করে কী লাভ হবে?

তাঁর স্ত্রী বলতেন: ধর্ম তো লাভ লোকসানের জন্য নয়, ধর্ম শান্তির জন্যে। মনে শান্তি পাবে।

আর একটা কথাও তিনি বলতেন, যাদের তুমি অনুকরণ কর, তাদের দেখেও কিছু শেখা উচিত। রবিবার সকালে তারা সপরিবারে গির্জায় যায় না? তারা কি লাভ লোকসানের কথা ভাবে!

এ সব কথা ঘোষাল সাহেবের আজকাল বেশি করে মনে পড়ে। এখন আর তিনি বেশিক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে পারেন না। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েন। মুখ হাত ধুয়ে জপতপও করে নেন ঘরের দরজা বন্ধ রেখে। বাইরে থেকে তা কেউ জানতে পারে না। গীতারও একটি অধ্যায় রোজ পাঠ করেন, কিন্তু তা মনে মনে। একাগ্র হয়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করেন। তারপর সে সব তুলে রেখে প্যাণ্ট কোট পরেন। যত্ন করে অনেক সময় নিয়ে বো বাঁধেন একটা। নিখুঁত ভাবে সেজে ঘরের দরজা খুলে বেরোন।

বেড-টী খাবার অভ্যাস এখন তাঁর নেই। লতিফকে জাগিয়ে দিয়ে তিনি বাগানে নেমে পড়েন। দরোয়ান গেটের তালা খুলতে দেরি করলেও রাগ করেন না কোনদিন। নিজেই তাকে ডেকে তোলেন। কারও কাছেই তিনি কিছু আশা করেন না। বাড়িতে তাঁর জন্যে কোন অসুবিধা হয়, এ তিনি চান না। কেউ কারও অসুবিধা সৃষ্টি করছে জানলে মনে মনে এখন তিনি অসন্তুষ্ট হন।

পথে যান বাহন চলাচল শুরু হবার আগেই তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তখন তাঁর এক পেয়ালা চা চাই, আর একটা চুরুট।

লতিফ তখন তৈরি হয়ে থাকে। তাঁর গায়ের কোট খুলে নিয়ে একটা ড্রেসিং গাউন পরিয়ে দেয়। ট্রেতে করে চা এনে দেয় সামনে। আর চুরুটের বাক্স।

মেয়ে তাঁর সব পুরনো অভ্যাস পেয়েছে। সে যেমন দেরিতে শোয়, তেমনি দেরিতে ওঠে। ব্রেকফাস্টের টেবলে ঘোষাল সাহেব বসে আছেন বলে লতিফ প্রায়ই তাকে ডেকে তোলে। কিন্তু মনিবকে লুকিয়ে এই কাজ করে। আজও তাই করল। সে জানত যে না ডাকলে শাশ্বতীর আজ অনেক দেরি হবে। তাই অপেক্ষা না করে আজ তাকে সময় মতোই জাগিয়ে দিল।

ঘুম ভাঙলে শাশ্বতী আর দেরি করে না। বাবা অপেক্ষা করছেন শুনলেই সে তাড়াতাড়ি নেমে আসে। আজও নেমে এল।

কিন্তু ঘোষাল সাহেব ভাবতে পারেন নি যে শাশ্বতী আজ এমন তাড়াতাড়ি নেমে আসবে। তাই তাকে দেখে বেশ আশ্চর্য হলেন, কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না।

শাশ্বতী বলল: কাল আমার বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই না বাবা!

ঘোষাল সাহেব 'হ্যাঁ' বলতে পারলেন না, 'না'ও বললেন না। উত্তরটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললেন: অনেক কাজ ছিল বুঝি!

শাশ্বতী বলল: ছোটখাট একটা ফাংশন ছিল।

কিসের ফাংশন?

সুজিতবাবু তো এবারে আমাদের টুমরো ক্লাবের নতুন সেক্রেটারি হয়েছে, ও একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিল।

ঘোষাল সাহেব বোধহয় ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারলেন না, তাই দেখে শাশ্বতী বলল: খানিকটা পাব্লিসিটির দরকার হয়েছিল।

লতিফ ব্রেকফাস্টের টেবল সাজিয়েই রেখেছিল। গরম দুধ আর

কর্নফ্লেক্স দিয়ে গেল বাবুর্চি। খানিকটা কর্নফ্লেক্সের উপরে গরম দুধ আর এক চামচ চিনি মিশিয়ে শাশ্বতী একটা স্যুপ প্লেট ঘোষাল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিল। নিজেও একটা প্লেটে দু চামচ চিনি মিশিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলল: এ সব ব্যাপারে সুজিতের দূর-দৃষ্টি আছে। বলে চামচে করে কর্নফ্লেক্স মুখে তুলতে লাগল।

খেতে খেতে ঘোষাল সাহেব বললেন: হ্যাঁ, যুগটাই তো পাবলিসিটির। ভাল পাবলিসিটি না হলে কোন চেষ্টাই সার্থক হয় না।

শাশ্বতী বলল: সুজিত ঠিক এই কথাই বলেছিল আমাদের।

বলেছিল নাকি!

হ্যাঁ। বলেছিল, কাজ তো সবাই করে, কিন্তু ঢাক ঢোল না পেটালে কি সেই কাজের কথা কেউ জানতে পারে! যারা যত ঢাক পেটাতে পারে, তারা ততই কাজের লোক বলে পরিচিত হয়।

ঘোষাল সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন: হুঁ।

শাশ্বতী বলল: এই দেখ না, দুর্ভিক্ষের জন্য কত লোকেই তো কত কিছু করছে। কিন্তু ক'জনে জানতে পারছে সে সব কাজের কথা।

ঘোষাল সাহেব বললেন: সত্যি, আমাদের ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধুরা প্রাণ দিয়ে খাটছেন, কিন্তু কেউ তাঁদের সম্বন্ধে একটা কথাও বলে না। খবরের কাগজেও দেখি না কোন খবর।

ঠিক এই জন্যেই সুজিত বলছিল যে ক্লাবের তরফ থেকে আমরা কিছু করবার আগে থেকেই ঢাক ঢোল পেটাতে থাকব।

তোমরা কিছু করছ নাকি?

তোমাকে বলি নি বুঝি! আমরা যে একটা নাটক অভিনয় করে টাকা তুলব বলে স্থির করেছি!

সত্যি নাকি!

এই কথাটা প্রচার করবার জন্যেই তো সুজিত কাল প্রেস

কন্‌ফারেন্স ডেকেছিল! সবাইকে বুঝিয়ে বলল ঃ আপনারা ভাববেন না যে এ একটা শখের ব্যাপার। কাগজে-পত্রে দুর্ভিক্ষের যে ভীষণ রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এই ব্যাপারটা আমরা খুবই সীরিয়াসলি নিয়েছি। এ সব ঘটনার প্রতিকার আমরা আর কতটুকু করতে পারি! তবে বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকেরই কিছু করা দরকার। এটা আমাদের কর্তব্য। যার যতটুকু সাধ্য, তাকে ততটুকুই করতে হবে।

ঘোষাল সাহেব মাথা নেড়ে বললেন ঃ খুব খাঁটি কথা।

শাশ্বতী বলল ঃ সুজিত সবাইকে বোঝাল যে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের ক্ষমতা খুব সীমিত। দশজনের কাছে সাহায্য চাইলে আমরা খুব সামান্যই রেস্‌পন্স্‌ পাব, কিন্তু একটা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে—

ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ হি ইজ রাইট। দেশের লোক তো আজকাল হুজুগ বোঝে, এ সব ব্যাপারে তারা বেশ ক্রেজি। কোন ফাংশনে দু' শো টাকার চেয়ার আছে জানলে একশো টাকার চেয়ারে আর বসতে চায় না। কিন্তু দশ টাকা সাহায্য চাইলে দরোয়ান দিয়ে বার করে দেয়।

শাশ্বতী খুশী হয়ে বলল ঃ তুমিও এই কথা বলছ!

বলব না? লোকের চরিত্র তো আজকাল এই রকমই হয়েছে। দু' শো টাকার টিকিট কিনেছি, নানা ভাবে এই কথাটাই সবার কাছে রাষ্ট্র করে বেড়াবে।

সুজিত ঠিক এই কথাই বলল সবাইকে। তাদের বোঝাল যে এই নাটকের সম্বন্ধে একটা ভাল পাবলিসিটি হওয়া দরকার। মানে, লোকে আগে থেকেই সব জানুক।

লতিফ এসে কর্ন্‌ফ্লেক্সের খালি প্লেট দু'খানা সরিয়ে নিয়ে গেল, আর বাবুর্চি দিয়ে গেল ডিমের পোচ আর টোস্ট। শাশ্বতী একখানা টোস্টে মাখন মাখিয়ে ঘোষাল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিতেই তিনি বলে উঠলেন ঃ আমাকে আবার মাখন মাখিয়ে দিচ্ছ কেন?

সরি।

বলে শাশ্বতী সেখানা নিজের প্লেটে রেখে অরেঞ্জ মার্মালেড মাখিয়ে একখানা টোস্ট তাঁর দিকে এগিয়ে দিল। সেখানা হাতে নিয়ে তিনি বললেন: এও বড় মিষ্টি। এই বয়সে মাখন আর মিষ্টি দুই-ই কম খাওয়া ভাল।

শাশ্বতী বলল: তোমার তো কোন রোগ নেই, তুমি এত ভয় পাও কেন!

সাবধান না হলেই রোগ হয়।

শাশ্বতী আবার তার পুরনো কথায় ফিরে এসে বলল: সুজিত একজন মন্ত্রীকেও ধরে এনেছিল।

মন্ত্রী!

হ্যা, মন্ত্রী বলেই তো পরিচয় দিল।

কী নাম বল তো!

শাশ্বতী তাচ্ছিল্যের সুরে বলল: নাম বলতে পারব না। কালো বেঁটে মতো ভদ্রলোক, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কথা বলে। মুখে রুমাল চেপে মেয়েরা হাসছিল।

ঘোষাল সাহেব টোস্টে একটা কামড় দিয়ে বললেন: মন্ত্রীরা বুঝি আজকাল এই সব কাজ করে বেড়ান!

শাশ্বতী বলল: দরকার ছিল আমাদের প্রেসের লোককে, মন্ত্রীকে নয়। সুজিত বলেছিল, একজন মন্ত্রী-টন্ত্রী ধরে আনতে পারলে প্রেসের লোকেরা সুড়সুড় করে আসবে! দেখা গেল কথাটা ঠিকই। বেশ সাক্‌সেস্‌ফুল হয়েছে ফাংশন।

হঠাৎ কী মনে পড়তেই শাশ্বতী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল: আজকের কাগজটা কোথায়?

ব্রেকফাস্টের টেবলে খবরের কাগজ কোনদিনই থাকে না। কাগজ শাশ্বতী পড়েও না। সেটা লিভিং-রুমে রাখা থাকে। ঘোষাল সাহেব নিজের সোফাটিতে বসে এই কাগজ পড়েন। লতিফ কাগজখানা আনবার জন্যে ছুটে গেল।

শাশ্বতী বলল: প্রেসের ক্যামেরাম্যান আমাদের একখানা ছবি নিয়েছে। আজকের কাগজে ফ্ল্যাশ করবে বলে কথা দিয়ে গেছে সুজিতকে।

ঘোষাল সাহেব কিছু বলবার আগেই লতিফ এসে খবরের কাগজখানা শাশ্বতীর হাতে দিল। শাশ্বতী প্রথম পাতাটা দেখল, দেখল শেষ পাতাটাও। তারপরে ভিতরের পাতাগুলোও দেখে নিয়ে বলল: না, কোন ছবি ছাপে নি তো!

বলে সরিয়ে রাখল কাগজ।

বাবুর্চি চায়ের পট দিয়ে গিয়েছিল। শাশ্বতী চা ঢেলে তার বাবাকে দিল, নিজেও নিল। বলল: এদের কথার ঠিক নেই। বলে এক, করে আর এক।

ঘোষাল সাহেব বললেন: তোমাদের মন্ত্রীর ছবিটা ছেপে দিয়েছে কিনা দেখ।

অসম্ভব নয়।

বলে শাশ্বতী আবার কাগজখানা দেখে নিল। তারপর আশ্বস্ত হয়ে বলল: না, কোন ছবিই ছাপে নি। খবরটাও হয়তো ছাপে নি।

ঘোষাল সাহেব বললেন: আমি তো চোখ বুলিয়ে নিয়েছি, আমার চোখে পড়ে নি।

শাশ্বতী বিরক্ত ভাবে উঠে পড়ল। বলল: সুজিত হয়তো এসে পড়বে। আমি চট্ করে তৈরি হয়ে নিই।

বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘোষাল সাহেব তাঁর চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে লিভিং-রুমে চলে এলেন। খবরের কাগজখানা এইবারে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। কিন্তু পোর্টিকোয় চটির আওয়াজ পেয়ে সোফায় আর বসলেন না, বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। হন্তদন্ত ভাবে হীরেনবাবু আসছেন দেখে খুশী হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন: এসো এসো, কাল রাতে তোমার কথাই ভাবছিলুম।

আমার সৌভাগ্য।

বলে হীরেনবাবু বারান্দায় উঠলেন।

ঘোষাল সাহেব তাঁকে লিভিং-রুমে এনে বসালেন, বললেনঃ কী ভাবছিলুম জানতে চাইলে না?

আমি কেন তোমার কাছে ছুটে এলুম, তাও তো জানতে চাইলে না!

ঘোষাল সাহেব লজ্জিতভাবে বললেনঃ তোমার উপদেশের কথাটা মনে থাকে না।

হীরেনবাবু বললেনঃ আমার উপদেশ নয়, বল ডেল কার্নেগীর পরামর্শ। সারা দিন নিজের কথা অন্যের ঘাড়ে চাপালে দু'দিনেই বাতিল হয়ে যাবে।

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ কথাটা খুব সত্যি, কিন্তু সব সময়ে মনে থাকে না। বিশেষ করে তোমার সামনে।

হীরেনবাবু তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু হাসলেন। বললেনঃ আমারও একই অবস্থা। এটা বয়সের দোষ, বুঝলে!

তারপরেই বললেনঃ বল। আগে তোমার কথাই শুনি।

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ তোমার কথাই আগে বল।

না না। তোমার কথাই হোক।

আমার সময় লাগবে। কাজেই তোমার কথাই আগে শেষ কর।

হীরেনবাবু এইবারে বললেনঃ তুমি কি জবাব দিতে পারবে? বোধহয় না।

প্রশ্নটা করই না।

তোমার মেয়ে কোন্ নাটকে অভিনয় করছে?

ঘোষাল সাহেব চমকে উঠে বললেনঃ তুমি একথা জানলে কী করে?

হীরেনবাবু বললেনঃ সবাই যে ভাবে জানে, আমিও সেই ভাবেই জেনেছি।

ঘোষাল সাহেব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে

বললেন ঃ খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু কোন্ নাটকের অভিনয় হচ্ছে, তা লেখে নি।

কই, এ কাগজে তো কিছু নেই!

হীরেনবাবু একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন ঃ তোমাদের মতো সাহেবদের কাগজে এ সব খবর থাকে না। এই জন্যেই আমি বাংলা কাগজ পড়ি।

ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ প্রশ্নটা তুমি ভালই করেছ। কিন্তু আমার মাথায় এ প্রশ্ন আসে নি। এলে শাশ্বতীর কাছে জেনে নিতুম। তুমি একটু বোসো ভাই। ও নীচে নামলেই জিজ্ঞেস করব।

তারপরে বললেন ঃ নাটকের সিলেকশনের উপরে টাকা তোলার ব্যাপার অনেকটা নির্ভর করে কিনা!

হীরেনবাবু তাঁর গলা নামিয়ে বললেন ঃ ব্যাপারটা কি জানো! আমার এক ছাত্র একখানা অদ্ভুত ভাল নাটক লিখেছে, তার নাম 'মানুষের ক্ষুধা'। গতবারে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তারই একটি চিত্র তুলে ধরেছে এই নাটকে। দর্শকেরা চোখের জলে ভেসে যাবে।

তারপরেই বললেন ঃ তুমি আগে থেকেই যেন কিছু বল না। নিজে থেকে সাজেস্ট করলে দাম কমে যাবে।

ঘোষাল সাহেব বিস্মিত ভাবে বললেন ঃ বুঝেছি।

বুঝেছ তো! এইবারে তুমি কী বলতে চেয়েছিলে বল।

এ কোন নতুন কথা নয়।

হীরেনবাবু বললেন ঃ মেয়ের সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কথা তো! কিন্তু আমার কথা তুমি কোন দিনই আমল দিলে না।

ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ আমল দেব কি। তুমি বলবে, সতর্ক হও। কিন্তু সতর্ক তো আমি সারাজীবন আছি। তুমি কি আমাকে মেয়ের কাজে বাধা দিতে বলছ?

হীরেনবাবু বললেন ঃ এখন আর তা সম্ভব নয়। এখন তাকে বোঝাতে হবে।

ঘোষাল সাহেব হাসলেন এই কথা শুনে, কোন উত্তর দিলেন না। তাই দেখে হীরেনবাবু বললেন: হাসলে যে?

ঘোষাল সাহেব বললেন: সারাজীবন ছেলেমেয়ে পড়িয়েছ তো! তোমার কথা শুনতে হবে বলেই তারা তোমার কথা শুনেছে। আর তাদের উত্তর দেবার কোন দায়িত্ব ছিল না বলেই তারা কোন তর্ক করে নি। জীবনের ক্ষেত্রে এ কাজ যে অচল, সে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তোমার হয় নি।

কেন?

নিজের ছেলেমেয়েরা তোমার কথা শুনবে না। তাদের সময় নেই। যদি জোর করে শোনাবার চেষ্টা কর তো আড়ালে তোমাকে বিদ্রূপ করবে। বেশি জোর করতে গেলে সামনেই দু' কথা শুনিয়ে দেবে।

হীরেনবাবু বললেন: এ তোমার অনুমানের কথা।

ঘোষাল সাহেব বললেন: তোমার সংসার নেই বলেই এ কথা বলছ।

আপত্তিকর কথা!

কেন?

আমি বিয়ে করি নি। আমার সংসার না থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্যে কোন অভিজ্ঞতা নেই, এ কোন যুক্তির কথা নয়। তোমার জীবনে ক'টা ছেলেমেয়ে দেখেছ? ক'জন বাপ মায়ের কথা তুমি জান? এক বছরের জন্যে অ্যামবাসাডার হয়েছিলে বলেই কি তুমি সবজান্তা হয়ে গেছ?

বলেই তিনি তাঁর লাঠিগাছটি সংগ্রহ করে উঠে পড়ছিলেন। ঘোষাল সাহেব দেখছিলেন যে বন্ধুর গোঁফ দাড়ির ফাঁকে গায়ের ফর্সা রঙ এখন লাল হয়ে উঠেছে। বোধহয় অপমানিত বোধ করেছেন। কিংবা ব্লাড প্রেসার আছে, তাই অল্পেই রেগে যান। তাই বন্ধুকে সামলাবার জন্যে তিনি বললেন: চটছ কেন! তোমার অভিজ্ঞতা আছে বলেই তো তোমার কাছে পরামর্শ চাইছি। তুমি যে সারা-

জীবন ছেলেমেয়ে নিয়ে কাটিয়েছ, তাতে তো আর সন্দেহ নেই! তাই বলছিলুম—

বাধা দিয়ে হীরেনবাবু বললেন : জানি।

তারপরেই লাঠিগাছটি রেখে আবার বসলেন। বললেন : তোমরা ভাব যে মানুষ সংসার না করলেই গাধা থেকে যায়।

ঘোষাল সাহেব হাসলেন এই কথা শুনে।

আর হীরেনবাবু বললেন : না না। এই রকমই তোমরা ভাব। তোমাদের ধারণা যে নিজে বিয়ে না করলে কোন অভিজ্ঞতাই হয় না।

ঘোষাল সাহেব খুব সংযত ভাবে বললেন : কথাটা তো মিথ্যে নয় ভাই। বই পড়া বিদ্যে আর হাতে কলমে শেখা বিদ্যের তফাৎ চিরকালই থাকবে।

হীরেনবাবু বললেন : এ বিদ্যের আলোচনা হচ্ছে না। তোমার মেয়ের সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। তুমি জানতে চাইছ। তাই বলছি। তোমার মেয়ের সম্বন্ধে তুমি যে ভাবনা ভাবছ, তা তাকে স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে। কিছু রেখে ঢেকে বললে চলবে না। তবে তোমরা যা এত কাল করে এসেছ, সেইরকম ডিক্টেটারের মতো করে বললে ফল ভাল হবে না। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। জীবনে যে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলবার প্রয়োজন আছে, নিজের স্বার্থেই প্রয়োজন, এই কথাই স্থির মাথায় তাকে বোঝাতে হবে।

ঘোষাল সাহেব বললেন : এ কাজটা তুমিই ভাল পারবে। আর তোমাকে সে শ্রদ্ধাও করে। আমার মনে হয়, একদিন সময় মতো তুমি তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।

হীরেনবাবু হেসে বললেন : ভয় পেয়েই এই কথা বলছ তো?

ভয় নয়, যা ভাল বুঝেছি তাই বললুম। আর বোঝাবার ক্ষমতা যে তোমার বেশি, তাতেও তো সন্দেহ নেই।

তোমার প্রস্তাবটি শুনতে বেশ মিষ্টি লাগছে। কিন্তু কাজের বেলায় তা হবে না। তোমার মেয়েকে আমি নিজের মেয়ের মতো

ভাবতে পারি, কিন্তু সে তো আমাকে তার বাপের মতো ভাবতে পারবে না।

কেন পারবে না! জ্যাঠা কি বাপের চেয়ে বড় নয়!

খুব সত্যি কথা, কিন্তু এই জ্যাঠাকে সে কবে চিনেছে! সারা-জীবনটা তাকে সঙ্গে করে বাইরে বাইরেই ঘুরলে, আজ মাত্র দু'বছর দেশে ফিরেছ। তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় তো এই দু' বছরের। এই মূলধন নিয়ে তাকে কিছু শিক্ষা দেবার চেষ্টা কি দুঃসাহসের কাজ হবে না! সে হয়তো আমার কথা বুড়ো মাস্টারের বাচালতা ভেবে আমলই দেবে না, নয়—

অপমান করবে ভয় পাচ্ছ? করবে না। সে রকম কু-শিক্ষা আমি তাকে দিই নি।

হীরেনবাবু বললেন: কিন্তু সত্যি কথাটা ভুলে যাচ্ছ।

কোন প্রশ্ন না করে ঘোষাল সাহেব বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন।

হীরেনবাবু বললেন: এ হল যুগের শিক্ষা, এ কাউকে দিতে হয় না। আর এ কোন নতুন শিক্ষাও নয়। ছেলেমেয়েরা চিরকালই বুড়োদের বোকা বলে বাতিল করে দিয়ে এসেছে। এক সময়ে আমরাও তাই করেছি। এখন বুড়ো হয়ে দোষ দিচ্ছি ছেলেমেয়েদের। বলছি, তারা কুশিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু এই শিক্ষা কি তারা আমাদের কাছেই পায় নি?

ঘোষাল সাহেব প্রতিবাদ করলেন না, প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। নিজের অতীত তাঁর মনে আছে, নিজের বাপের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথাও। তিনিও খুব বাধ্য ছেলে ছিলেন না। তাঁর সময়ের কোন বাধ্য ছেলের কথাও তাঁর চট করে মনে পড়ল না, যার নজির দেখিয়ে প্রতিবাদ করতে পারেন। তাই একটু নরম সুরে বললেন: কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে তো!

হীরেনবাবু তৎপর ভাবে বললেন: এই ভাবে একটি বিতর্কিত শব্দ ব্যবহার করেছ। সীমা! এই সীমার কোন সীমানা আছে? নেই। তা থাকলে খুব সুবিধা হত।

তারপরেই বললেন : এই আমাদের আর্যাবর্তের সীমার কথাই ভাব। শাস্ত্রে বলেছে, তার দু'ধারে সমুদ্র ছিল। বিদেশী পণ্ডিতরা বললেন, এই দুই সমুদ্র হল বঙ্গোপসাগর আর আরব সাগর। কিন্তু এদেশের পণ্ডিতরা এই আর্যাবর্তকে এত ছোট ভাবতে রাজী নন। বললেন, তা মোটেই নয়, এই দুই সমুদ্র হল চীনের সমুদ্র আর ভূমধ্যসাগর ! মানে গোটা এশিয়াটাই ছিল আর্যাবর্ত।

ঘোষাল সাহেব বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। এই আর্যাবর্ত থেকে আরও কত কী এসে পড়বে। এই ভেবে বলে উঠলেন : দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা একটু বুঝতে দাও।

হীরেনবাবু বললেন : ভয় পাচ্ছ কেন, এ আমার কোন বক্তৃতার ভূমিকা নয়। তোমাকে বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দিলুম। আমি বলতে চাইছি যে বাংলায় সীমা শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হল লিমিট। এই লিমিটের কোন সীমা নেই ! থাকলে সবারই সুবিধে হত।

ঘোষাল সাহেব এর উত্তরে বললেন : তবে কি তুমি বলতে চাও যে ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপারে আমার মেয়ে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না ?

হীরেনবাবু তার কাঁচাপাকা দাড়ি দুলিয়ে বললেন : তবেই দেখ, আমার কথাটি তুমি একেবারেই বুঝতে পার নি। এ তোমাদের চরিত্রের দোষ। মানে চিরকালই তোমরা অপরকে বোকা বুঝিয়ে এসেছ, নিজেরা কিছু বোঝবার প্রয়োজন বোধ কর নি।

এ রকম অভিযোগ শুনতে ঘোষাল সাহেব অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ; তাই আর রাগ করেন না। তিনি অবসর নেবার বছরখানেক পরে হীরেনবাবুও অবসর নিয়েছেন। তখন থেকেই তাঁর যাতায়াত বেড়েছে। পুরনো বন্ধুতাও গভীর হয়েছে নতুন করে। তাই তাঁরা এখন পরস্পরকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন না। আবার এই আক্রমণটা তিক্ত হতেও দেন না, নিজেরাই সামলে নেন পরিবেশটি। ঘোষাল সাহেবও সামলে নিলেন, বললেন : বুঝিয়ে না বললে লোকে বুঝবে কী করে। সেটাও তো নিজে বুঝে দেখবে।

হীরেনবাবু বললেন: এতক্ষণ কী বললাম আমি! বলেছি, সীমা কথাটিরই কোন সীমা নেই। তুমি যাকে সীমা বলে ভাবছ, তোমার মেয়ে তা ভাবছে না। তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই জানে যে সে সীমার মধ্যেই আছে।

মানে?

মানে হচ্ছে এই যে তোমার মেয়েকে যেভাবে মানুষ করেছ, তাতে সে শিখেছে যে স্বাধীনতার কোন সীমাই নেই। যা খুশি করতে পারার নামই স্বাধীনতা। আর সেই জন্য সে যা খুশি তাই করে। কোন কিছুর সীমা ছাড়াচ্ছে বলে সে ভাবতেই শেখে নি।

ঘোষাল সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু হীরেনবাবু থামলেন না। বললেন: দুঃখ করে এখন কোন লাভ নেই ভাই। তবে চেষ্টা ছাড়তে বলছি না। অন্ততঃ তোমার বর্তমান মনোভাবটা তাকে জানানো খুব দরকার।

ঘোষাল সাহেব কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেন না দেখে তিনি আবার বললেন: কেন তা জানতে চাইলে না?

শ্রান্ত কণ্ঠে ঘোষাল সাহেব বললেন: তুমি নিজেই বলবে জানি।

কিন্তু হীরেনবাবু আর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। বাড়ির ভিতরে একখানা গাড়ি ঢোকার শব্দে ঘোষাল সাহেব উৎকর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে সহসা অন্যমনস্ক হতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: কী হল?

গাড়ি পোর্টিকোয় এসে দাঁড়াতে তিনি নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। বললেন: আমি তাহলে এখন উঠি।

বলে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘোষাল সাহেব বাধা দিয়ে বললেন: উঠছ কেন?

হীরেনবাবু বসে বসেই বললেন: সারাক্ষণ তোমাকে আগলে রাখার কোন অর্থ হয় না। লোকে তোমাকেও হয়তো একটু একা পেতে চায়।

ঘোষাল সাহেব এ কথার উত্তর না দিয়ে একটু হাসলেন।

আর এই সময়েই সুজিত বাসু এসে ঘরে ঢুকল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলল : গুড্ মর্নিং।

তারপর তৎপর ভাবে ঘোষাল সাহেবের দিকে এগিয়ে এল।

ঘোষাল সাহেব অল্প একটু উঠে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন, আর মুখে বললেন : মর্নিং।

সুজিত তারপরে হীরেনবাবুর দিকেও হাত বাড়াল। তিনি বসে বসেই তাঁর হাত বাড়িয়ে বললেন : বসুন।

সুজিত বসবার পরে তার চেহারাটা তিনি ভাল করে দেখতে লাগলেন। বেশ লম্বা চেহারা তাতে সন্দেহ নেই। মাথায় চুলগুলোও লম্বা, কোটের কলারের উপরে থোকা থোকা ঝুলে আছে। এক সময়ে মেমসাহেবদের অনুকরণে ভারতীয় মেয়েরা এই ভাবে চুল ছেঁটে রাখত। কিন্তু মেয়ে বলে যাতে ভুল না হয়, তার জন্যে ঝুলপিটা কানের নীচে অবধি নামানো। ঠোঁটের উপরে কালো গোঁফও মশমশ করছে। হীরেনবাবুর মনে হল যে তার গায়ের রংটা ফর্সা বলেই রক্ষে, তা না হলে তাকে জহ্লাদের পার্টে মানাত ভাল।

হীরেনবাবু সুজিতের পোশাকটাও দেখলেন। বিলিতী কুকুরের লম্বা কানের মতো শার্টের কলার গাঢ় সবুজ রঙের। তার উপরে লাল টাই-এর বিরাট নট কোটের ফাঁকা জায়গাটুকু সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে। বড় বড় চেকের সুট। কোটের চওড়া কলার, তালি দেওয়া পকেট। প্যান্টের পা দুটোও চওড়া, আর নীচেটাও চওড়া করে ওলটানো। পায়ের জুতো বুট জুতোর মতো থ্যাবড়া মাথার, কিন্তু মাপে ছোট আর মেয়েদের মতো উঁচু হিলের। এর জন্যেই সুজিতকে বোধ হয় বেশি লম্বা দেখায়।

তার হাতে এক গোছা খবরের কাগজ ছিল। আর বেশ কিছুটা উত্তেজিতও দেখাচ্ছিল। ঘোষাল সাহেবের দিকে চেয়ে কতকটা অসহিষ্ণু ভাবে জিজ্ঞাসা করল : শাশ্বতী কি বেরিয়ে গেছে ?

ঘোষাল সাহেব বললেন : বেরোবোর জন্যেই বোধহয় তৈরি হচ্ছিল।

শাশ্বতী বেরিয়ে গেছে কিনা বুঝতে না পেরে সুজিত বলল: তাকে একটা কথা বলার দরকার ছিল।

ঘোষাল সাহেব বললেন: বেরোবার আগে বোধহয় এ দিকে হয়ে যাবে।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুজিত বলল: কাল আমাদের একটা খুব ভুল হয়ে গেছে।

কী রকম?

বলে ঘোষাল সাহেব তার মুখের দিকে তাকালেন।

কালকের ফাংশনে এক মন্ত্রীকে এনে এখন খুব পস্তাতে হচ্ছে।

কেন?

হতভাগা প্রেস তাঁরই কথায় পঞ্চমুখ, আমাদের কথা একটিও লেখে নি। আমাদের কারও নামেরই উল্লেখ করে নি।

ঘোষাল সাহেব বললেন: আমি যেন শুনেছিলুম যে মন্ত্রীদের বক্তৃতা ছাপায় সরকারী নিষেধ আছে!

সে বোধহয় শুধু ছবি ছাপার ব্যাপারে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কারও ছবি ছাপা যাবে না। তাই ভেবেছিলাম যে আমাদের পার্টির একটা ছবি নিশ্চয়ই ছাপবে।

হীরেনবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন, কিন্তু নিজে কোন কথা বলছিলেন না। ঘোষাল সাহেব তাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখে বললেন: ছবি ছাপলে কি কিছু সুবিধে হত?

হত বৈকি। ছবি মানেই তো অ্যাট্রাকশন, সিনেমার ট্রেলারের মতো।

কাঠের সিঁড়ির উপর হালকা চটির শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল যে শাশ্বতী এবারে উপর থেকে নামছে। একটু পরেই সে এসে এই ঘরে ঢুকবে। সুজিত উৎসাহ পেয়ে বলল: বুঝতেই পারছেন, যারা পয়সা দিয়ে টিকিট কিনবে, তারা নায়ক-নায়িকার নাম চায়, আর অপরিচিত নাম হলে ছবি দেখতেও চায়। কোনও নাটকের অভিনয় সার্থক করার জন্যে তার নায়ক-নায়িকার—

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। সুজিত বুঝতে পেরেছিল যে শাশ্বতী খুব ধীরে ধীরে ভিতরে আসছিল, তার কথাবার্তার অনেকখানিই সে শুনতে পেয়েছে।

হীরেনবাবুও ঠিক এই সময়েই একটা কথা বলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই কথার প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করা চলে নাটকের নাম। কিন্তু তার আগেই শাশ্বতী ঘরে ঢুকে পড়ল।

চকিতে পাশ ফিরে সুজিত তার হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু শাশ্বতী তার হাত বাড়াল না দেখে নিজের হাতখানা ফিরিয়ে নিয়ে বলল: লোকগুলো সব ট্রেটার।

শাশ্বতী বলল: এটা আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল।

সুজিত বলল: বম্বের প্রেস এ রকম নয়। পাবলিকও অন্য রকম। তারা মন্ত্রী-ফন্ত্রীর কথা শুনতে চায় না, তারা অভিনেতা-অভিনেত্রীর কদর বোঝে। তাদের মুখ থেকে দুটো কথা শোনবার জন্যে সমস্ত খবরের কাগজগুলো তারা পুড়িয়ে ফেলতে রাজী।

তারপরেই বলল: এখন ভরসা শুধু নতুন কাগজখানার ওপরে।

কোন্ কাগজ?

ঐ যে একখানা নতুন সিনেমার কাগজ চালু হয়েছে! কিন্তু তারা আবার একটু কেচ্ছা-কাহিনীর ভক্ত। তা দরকার হলে—

বাধা দিয়ে শাশ্বতী বলল: তুমি কি এখন বসবে?

না, বসবার সময় নেই। নতুন অফিস তো, একটু সামলে চলতে হচ্ছে।

তাহলে চল। বেরিয়ে পড়ি। আসি জ্যাঠামশাই।

বলে শাশ্বতী একবার তার বাবার দিকে আর একবার হীরেনবাবুর দিকে তাকাল। হীরেনবাবু আর দ্বিধা না করে বললেন: একটা কথা ছিল মা, তোমাদের বলব কিনা বুঝতে পারছি না!

শাশ্বতী থমকে দাঁড়িয়ে বলল: নিশ্চয়ই বলবেন।

হীরেনবাবু বললেন: তোমরা কি কোন নাটক সিলেক্ট করেছ?

উত্তরে সুজিত বলল : না। ভাবছি বেকেট বা ব্রেখটের কোন নাটক—

বাধা দিয়ে শাশ্বতী বলল : আপনার কি কোন সাজেশন আছে জ্যাঠামশাই ?

হীরেনবাবু খুশী হয়ে বললেন : সাজেশন ঠিক নয়। ভাবছিলুম, সময়োপযোগী কোন বাংলা নাটকের অভিনয় হলেই বেশ মানানসই হত।

ঘোষাল সাহেব বললেন : তুমি যে নাটকটির কথা জান বল না।

'মানুষের ক্ষুধা'।

সুজিত বলল : বেশ নাম তো !

উৎসাহ পেয়ে হীরেনবাবু বললেন : গত দুর্ভিক্ষের সময়ের ঘটনা নিয়ে লেখা। ছেলেটি ভালই লিখেছে।

সুজিত বলল : তাকে বলুন না আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

বলব ?

নিশ্চয়ই বলবেন।

বলে দুজনেই একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ঘোষাল সাহেবের চুরুটে অনেকটা ছাই জমেছিল। অ্যাস-ট্রেয় সেই ছাই ঝেড়ে তিনি খানিকটা ধোঁয়া নিলেন মুখে। সুজিতের গাড়ি বেরিয়ে যাবার শব্দ পেলেন। শাশ্বতীও বোধহয় তার গাড়ি নিয়ে গেল। শাশ্বতী একা হলে তিনি বাইরে বেরিয়ে হাত নেড়ে মেয়েকে বিদায় জানাতেন। এই অভ্যাসটি তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে পেয়েছিলেন। শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি সময় মতো বেরিয়ে এসে ঘোষাল সাহেবের বেরোবার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। হাত নেড়ে বিদায় জানাতেন ঘোষাল সাহেবকে। এখন তিনি নিজে বেরোন না। বেরোয় তাঁর মেয়ে। এখন তাঁর স্ত্রী নেই। তাই নিজে গিয়ে বাইরে দাঁড়ান। ঘোষাল সাহেব খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। তাই দেখে হীরেনবাবু বললেন : কী ভাবছ ?

ঘোষাল সাহেব উত্তরে অন্য কথা বললেনঃ এই ছেলেটাকে তোমার কেমন লাগে বল তো !

কেন এ কথা জানতে চাইছ ?

বলে হীরেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

ঘোষাল সাহেব নিরুদ্বেগে বললেনঃ এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম।

উঁহু। নিশ্চয়ই তোমার মনে কোন উদ্দেশ্য আছে।

বলে হীরেনবাবু তাঁর গোঁফ-দাড়িতে ভরা মুখখানা দোলাতে লাগলেন।

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ ছেলেটা অল্পদিন হল বম্বে থেকে বদলি হয়ে এসেছে। আর এখন দেখতে পাচ্ছি—

বলে চারি ধারে একবার চেয়ে দেখে বললেনঃ শাশ্বতীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

হুঁ।

বলে হীরেনবাবু চুপ করে রইলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘোষাল সাহেব বললেনঃ দুজনের পুরনো পরিচয় থাকাও অসম্ভব মনে হচ্ছে না।

কেন ?

একেবারে নতুন পরিচয় হলে এত তাড়াতাড়ি এমন ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়।

হীরেনবাবু এবারে গম্ভীর হয়ে বললেনঃ জাত ধর্মেরও একটা প্রশ্ন আছে।

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ সেটা আজকাল প্রথম কথা নয়।

কিন্তু তুমি হচ্ছ ঘোষাল বংশের ছেলে। আচার নিষ্ঠা মান না বলে তোমার কুলটা তো বদলায় নি। তোমার এক গণ্ডা ছেলেমেয়েও নেই, আর কোন ছেলেমেয়ে বেজাতে বিয়ে করে কুলেও কালি দেয় নি।

ঘোষাল সাহেব হাসলেন একটুখানি, বললেনঃ তুমি দেখছি

এখনও তোমার বাপ-পিতামহের যুগে পড়ে আছ। যুগটা যে বদলে গেছে, তা ভুলে যাচ্ছ কেন! আমরাই কি সে যুগে মহাত্মাজীর ডাকে হরিজনদের সঙ্গে একপাতে বসে ভাত খাই নি!

তারপর বাড়ি ফিরে মারও খেয়েছিলুম।

কিন্তু সবাই খাই নি। সেদিনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে জাতের বিচার এ দেশ থেকে উঠে যাবে, তোমার জাত তুমি আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে না। এমন দিন হয়তো আসছে যে জাতের কথা লোকে ভুলেই যাবে।

হীরেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: তাই বলে আমরা কি এই পরিবর্তনটা ত্বরান্বিত করব!

ঘোষাল সাহেব আরও গম্ভীর হয়ে বললেন: তুমি এ কথা বলতে পার, কিন্তু আমি পারি না। আমাকে আমার চোখ কান খুলে রাখতে হবে। নিজের জাত আঁকড়ে থাকলে আমারই হয়তো ক্ষতি হবে।

ক্ষতির ভয়ে কি আগে থেকেই হাল ছেড়ে দেবে নাকি!

এ আলোচনা থাক ভাই। তার চেয়ে সুজিত ছেলেটাকে তোমার কেমন লাগে তাই বল।

হীরেনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন: দেখতে শুনতে ভালই। মানে, ব্যক্তিত্ব আছে, হাব-ভাব কায়দা কানুন—

বাধা দিয়ে ঘোষাল সাহেব বললেন: কায়দা-কানুনের কথা বল না, ওটা তুমি বুঝবে না।

হীরেনবাবু তখনই বললেন: হ্যাঁ, ওটা শুধু তোমারই জানবার ও বোঝবার কথা।

ঘোষাল সাহেব বললেন: দেখ, আর যাই কর, কার্টসি ও ম্যানার্সের বিচারটা তুমি আমার ওপরে ছেড়ে দিও।

তার মানে কি এই যে আমরা অসভ্য?

আমাদের অন্য রকমের সভ্যতা। ওদের সভ্যতার বিচার তুমি করতে পারবে না।

মানে ?

মানে খুব সোজা। আজকেরই একটা দৃষ্টান্ত নাও।

বল।

সুজিত ঘরে ঢুকেই বলেছিল, গুড মর্নিং। ঘরে ঢোকবার আগে কি আমার অনুমতি নিয়েছিল ?

হীরেনবাবু বললেন ঃ তার কোন দরকার হয় না।

ঘোষাল সাহেব তখনই মেনে নিয়ে বললেন ঃ ঠিক কথা। বিলেতী ম্যানার্স অনুসারে আমি তাকে গুড মর্নিং বলব সে আমাদের অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়েছে বলে। সে যে অবাঞ্ছিত নয়, সেটা বোঝাবার জন্যে এই নিয়ম হয়েছে। কিন্তু অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকলে তাকেই গুড মর্নিং বলতে হত।

হীরেনবাবু বললেন ঃ এ দেশে এ সব কেউ মানে না।

তার মানে এ নয় যে বিলেতী ম্যানার্সটা এ দেশে পালটে গেছে। তারপরে তোমার নিজের কথাই ধর। তুমি যে ইংরেজী বল তা যে বিশুদ্ধ ইংরেজী তাতে সন্দেহ নেই। নেসফিল্ড্ সাহেব বেঁচে থাকলে তোমার ইংরেজী পড়ে তোমাকে নাইটহুড দেবার জন্যে বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে ইংরেজীতে কথা বলতে শুনলে জিজ্ঞেস করতেন, কোন্ ভাষায় তুমি কথা বলছ ?

হীরেনবাবু আশ্চর্য হয়ে তাকালেন বন্ধুর মুখের দিকে।

ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ বুঝতে পারলে না তো! ব্রজেন শীলের গল্পটা তাহলে তোমাকে বলি। জান তো, তিনি পৃথিবীর অনেকগুলো ভাষা জানতেন।

হীরেনবাবু বললেন ঃ জানি। গোটা ষোলর কম হবে না।

ফরাসীও জানতেন, আর ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন।

তাও শুনেছি।

ফ্রান্সের একটা হোটেলে যা ঘটেছিল, তাই তোমাকে বলি। হোটেলের রুম-মেইড এসে জিজ্ঞেস করল, কী খাবে আজ? ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রশ্ন, তিনিও উত্তর দিলেন ফ্রেঞ্চে। কিন্তু সেই মেয়েটা এক বর্ণও বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন্ ভাষায় কথা বলছ? ব্রজেন শীল আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন, ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই তো বলছি। মেয়েটি কাগজ পেনসিল এগিয়ে দিয়ে বলল, লিখে দাও তো! নির্ভুল ফ্রেঞ্চে তিনি সব কথা খসখস করে লিখে দিলেন।

ঘোষাল সাহেব একটু থেমে বললেন: তাহলে তোমার মতে সুজিত এখনও আদব-কায়দা শেখে নি, এই তো!

শেখে নি বলব না, বলব যে এই শিক্ষা নিয়ে বিলেতে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে গেলে ফেল হয়ে যেত। তবে ঘষে মেজে ওকে তৈরি করা যেতে পারে।

হীরেনবাবু বললেন: হুঁ। এখনও তোমার এ অভিমান আছে জানি। কিন্তু আর লাভ নেই, বুঝলে!

বলে লাঠিগাছটা সংগ্রহ করে উঠে পড়লেন।

ঘোষাল সাহেব আর তাঁকে বাধা দিলেন না।

হীরেনবাবু নিজের বাড়িতে ফিরলেন না। হনহন করে চললেন সাত্যকির বাড়ির দিকে। সাত্যকি ভট্টাচার্য তাঁর প্রিয় ছাত্র, এখন অধ্যাপনা করছে। বুক-পকেটের ঘড়িটা বার করে সময় দেখেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে এখনও তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে। তার বাড়ি দূরে নয়, হেঁটে যেতে মিনিট কয়েক মাত্র সময় লাগবে। আর তার প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস থাকলেও এত তাড়াতাড়ি সে বাড়ি থেকে বেরোবে না।

হীরেনবাবুর মনে পড়ল, বিহারের দুর্ভিক্ষের সময়ে সাত্যকি একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেবার কাজে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিল। এম. এ. পাস করে একটা চাকরির চেষ্টায় সে তখন বাড়িতেই বসে

থাকত, আর হীরেনবাবুও কলেজ থেকে অবসর নেন নি। সাত্যকি ফিরে আসবার পরে তিনি জানতে চেয়েছিলেন: কী দেখে এলে বল তো!

সাত্যকি সেই গল্প তাঁকে বলেছিল। বলতে বলতে বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছিল সাত্যকি, দু'চোখ তার জলে ভরে উঠেছিল। সব কথা শোনবার পরে হীরেনবাবু তাকে বলেছিলেন, যা দেখে এলে তা লিখছ না কেন?

সাত্যকি সেদিন এ কথার কোন জবাব দেয় নি।

হীরেনবাবু কিন্তু ভোলেন নি এই কথা। যখনই দেখা হত, কিছু লেখার জন্যে উৎসাহ দিতেন সাত্যকিকে। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করেছিল যে একখানা নাটক সে লিখেছে। 'মানুষের ক্ষুধা' নাম দেবে সেই নাটকের। এ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নয়। এ ক্ষুধা বর্তমান সভ্য সমাজের, ক্ষুধার্ত মানুষকে মরতে দেখেও যে ক্ষুধার অবসান হয় না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাত্যাক এই কালক্ষুধা দেখে এসেছে। তাকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছে এই 'মানুষের ক্ষুধায়'।

আরও অনেক কথা হীরেনবাবুর মনে পড়ে গেল। এই দেশ ও এই সমাজের কথা। এই দেশেরই ধনী ও ক্ষমতাশীল মানুষ নিজের দেশেরই অসহায় জনসাধারণকে কী ভাবে নিয়ত শোষণ করছে শাসন ও সমাজ সংস্কারের নামে, সেই করুণ কাহিনী সাত্যকি সেদিন তার সামনে পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। নাটকটি লেখা হয়ে গেছে জানবার পরে তিনি তা পড়ে দেখেন নি, শুনতেও চান নি। কেন সেই ইচ্ছে তাঁর হয় নি, সে কথা এখন তিনি মনে করতে পারছেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি আমাকে যা বলেছিলে, তা কি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছ?

সাত্যকি বলেছিল: চেষ্টা করেছি।

সফল হয়েছ কি না তা কাউকে জিজ্ঞাসা করেছ?

না স্যার।

কেন?

আমার দুর্বলতা আমি জানি তো, তাই কারও মতামত জানতে চাই নি।

হীরেনবাবু চটে উঠে বলেছিলেন: তুমি কি চিরকাল এমনি ভাল মানুষ হয়েই থাকবে! দু'দিন পরে তো তোমাকে সংসারী হতে হবে, আমার মতো ইয়ে হয়ে থাকলে তো চলবে না!

সাত্যকি মাথা নীচু করে ছিল, কোন জবাব দেবার চেষ্টা করে নি।

হীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোমার নাটকটা কোন প্রকাশককে দেখিয়েছিলে?

সাত্যকি বলেছিল: একজনকে দেখিয়েছিলাম। সে বলল, এ লেখা চলবে না।

কেন চলবে না?

এতে কোন কমার্সিয়াল অ্যাপিল নেই।

হীরেনবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছিলেন: তারপরেই ফেলে রেখে দিলে তো লেখাটা!

সাত্যকি ভয়ে ভয়ে বলেছিল: ভেবেছি, এর ইংরেজী অনুবাদ করে কোন বিদেশী সংস্থাকে পাঠাব।

হীরেনবাবু বলেছিলেন: একটা কিছু কর সাত্যকি, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না।

এর পরে এই নাটকের সম্বন্ধে তিনি আর কোন খবর নেন নি। বোধহয় ভুলেই গিয়েছিলেন। আজকের কাগজে যখন পড়লেন যে টুমরো ক্লাবের সদস্যরা বাংলার দুর্ভিক্ষের পীড়িত জনগণের সাহায্যে একটি নাটকের অভিনয় করবে, আর শাশ্বতী নেবে নায়িকার ভূমিকা, তখনই তাঁর সাত্যকির সেই নাটকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি তার নাটকটি মঞ্চস্থ করানোর পরিকল্পনা নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

হীরেনবাবু জানেন যে সাত্যকিকে বললে সে তার নাটক নিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করবে না। তাকেই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে শাশ্বতীর

হাতে তুলে দিতে হবে। ছেলেটার সব গুণ আছে, নেই শুধু উদ্যম। উদ্যমের অভাবেই নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না।

এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি সাত্যকির বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। বাড়ির বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তেই সাত্যকি বেরিয়ে এল। হীরেনবাবুকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠল ঃ স্যর!

তারপরেই ঝপ করে নীচু হয়েই তাঁর পায়ের ধূলো নিল।

বাধা দিয়ে হীরেনবাবু বললেন ঃ এ সব কী করছ সাত্যকি! এ যুগে এ সব কি আর কেউ করে!

সাত্যকি কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা না করে বলল ঃ ভেতরে আসুন স্যর।

বলে তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এল।

হীরেনবাবু একখানা চেয়ারে বসেই বললেন ঃ একটা দরকারে তোমার কাছে এলুম।

তা আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন স্যর!

কেন, তোমার কাছে এসে কি আমি অন্যায় করেছি!

না স্যর, অন্যায় নয়। আমি আপনার কষ্টের কথা বলছি।

হীরেনবাবু বললেন ঃ তা খবর দিতে তো আমাকেই আসতে হত! তা আজই খবরও দিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবে।

তারপরেই বললেন ঃ তোমার সেই নাটকের পাণ্ডুলিপিটা বার কর তো!

সাত্যকি সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ধমক দিয়ে বললেন ঃ যা বলছি শোন।

সাত্যকি কোন প্রশ্ন না করেই দেওয়ালের তাক থেকে পাণ্ডুলিপিটা টেনে বার করল। তারপরে ধুলো ঝেড়ে সেটা হীরেন-বাবুর হাতে দিল।

তিনি সেটার দু' একটা পাতা উলটে নেড়ে-চেড়ে দেখে বললেন ঃ এর ইংরেজী অনুবাদটা কি করে ফেলেছ?

করেছি।

একটা কপি দাও তো!

সাত্যকি অপরাধীর মতো বলল: এখনও টাইপ করানো হয় নি।

কোন দিনই হবে না। তোমার হাতের লেখা কপিটাই আমাকে দাও। আমিই টাইপ করিয়ে দেখি কী করতে পারি।

সাত্যকি সেগুলোও বার করে ধূলো ঝেড়ে হীরেনবাবুর হাতে দিল।

পাণ্ডুলিপি দুখানা হাতে নিয়ে হীরেনবাবু বললেন: আজ তাহলে চলি, বুঝলে!

সাত্যকি আশ্চর্য হয়ে বলল: এখুনি চললেন!

হ্যাঁ।

বলে তিনি দরজার দিকে পা বাড়াতেই সাত্যকি বলল: মা'র সঙ্গে দুটো কথা বলে যাবেন না?

হীরেনবাবু বললেন: আজ আমি খুবই ব্যস্ত আছি সাত্যকি, আর একদিন এসে তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে যাব।

বলে আর অপেক্ষা করলেন না।

সাত্যকি খানিকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

হীরেনবাবু যেমন এসেছিলেন, তেমনি হনহন করে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। বাংলার চেয়ে ইংরেজী পড়তেই তাঁর ভাল লাগে। সারা দুপুর পড়ে তিনি ইংরেজী অনুবাদটা শেষ করে ফেললেন। অভিভূত হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপরে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে তাঁর গালের উপর দিয়ে। নায়িকার বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর নিজের হৃদয়ে। চোখের জল মুছে তিনি উঠে পড়লেন। হাঁক দিয়ে ডাকলেন: হারাধন!

তাঁর বুড়ো চাকর কাছেই কোথায় শুয়ে ছিল। চোখ রগড়ে উঠে এল।

হীরেনবাবু বললেনঃ আমি একটু বেরোচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

হারাধন আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ আজ এখুনি বেরোচ্ছেন !

হ্যাঁ, কাজে বেরোচ্ছি, এখুনি ফিরে আসব।

বলে সেই ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি বিশ্বাস করেন যে সব কাজেরই একটা সময় আছে। সেই সময়টি হাত ছাড়া হতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়। যারা বোকা, তারাই বিলম্ব করে।

পাণ্ডুলিপিটা হীরেনবাবু টাইপ করতে দিলেন, বললেনঃ দু'দিন সময় দিলাম। দেরি হলে আমার চলবে না।

খানিকক্ষণ বসে থেকে কাজটা ধরিয়ে দিলেন। প্রথম পাতাটা দেখে বললেনঃ এই রকম নির্ভুল হওয়া চাই। বিদেশে যাবে, বুঝতে পারলে ! ভুল থাকলে দেশের দুর্নাম।

হীরেনবাবু নিজের বাড়িতে ফিরেও আর বসলেন না। বললেনঃ আমাকে আবার বেরোতে হবে হারাধন, তুমি এখন কোথাও বেরিয়ো না।

হারাধন অনেক দিনের পুরনো ভৃত্য। প্রভুর এই রকম পাগলামির সঙ্গে সে পরিচিত। নীরবেই সে থাকে, প্রখর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে প্রভুকে। কোন বিপদ-আপদ না হয়, এই জন্যেই তার উদ্বেগ। কোথায় তিনি যাচ্ছেন, এ কথাটা বলে গেলে সে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। অন্য দিনের মতো আজও সে তাই আশা করেছিল। কিছু না বলে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

হীরেনবাবু বললেনঃ পথ আটকাচ্ছিস কেন ?

হারাধন নিরুত্তর।

ও, কোথায় যাচ্ছি বলে যেতে হবে !

হারাধন প্রসন্ন হল।

হীরেনবাবু বললেন ঃ ঘোষাল সাহেবের কাছে যাচ্ছি। ফিরতে বোধহয় দেরি হবে।

হারাধন সরে গেল সামনে থেকে। কিন্তু হীরেনবাবু আপন মনে বললেন ঃ মেয়ে রোজই দেরিতে ফেরে, কিন্তু কত দেরিতে ফেরে তা তো জানি নে।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন 'মানুষের ক্ষুধা'র পাণ্ডুলিপি।

ঘোষালসাহেব তখন তাঁর বাড়ির বাগানে পায়চারি করছিলেন, আর মালীকে নানারকমের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। হীরেনবাবুকে ব্যস্ত ভাবে বাড়িতে ঢুকতে দেখে এগিয়ে গেলেন। বললেন ঃ এমন ব্যস্ত কেন ভাই ?

হীরেনবাবু বললেন ঃ ব্যস্ত না হয়ে আর উপায় কী বল ? একালের ছেলেরা যা হয়েছে, নিজেদের ভাল-মন্দটাও নিজেরা বোঝে না।

কী রকম ?

এই দেখ না সাত্যকির কাণ্ড! নাটকটা লিখে নিজের তাকের ওপরেই ফেলে রেখে দিল। ধুলো জমছিল এর ওপরে। কোন হুঁশ নেই। আমি এদের বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। ডি. ফিল., ডি. লিট. হবার পরেও এদের বুদ্ধি খোলে না। ইস্কুলের পরীক্ষায় পাস করে যেদিন কলেজে আসে, সেদিনও যেমন, যেদিন কলেজে পড়াতে আসে, সেদিনও তেমনি। এখনও স্যর বলতে অজ্ঞান। ভাবে, স্যরই সব করবে। আরে বাবা, স্যর কি চিরদিন বাঁচবে! নিজের পায়ে কোন দিন দাঁড়াতে হবে না।

ঘোষাল সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন ঃ তোমার মতো কৃতি তো সবাই নয়। তোমার ছাত্ররা তাই তোমার উপরেই নির্ভর করে থাকে।

হীরেনবাবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন বন্ধুর মুখের দিকে। বললেন ঃ তামাশা করছ নাকি ?

ঘোষাল সাহেব এবার উত্তর না দিয়ে বললেন: এসো, ভেতরে এসো।

বলে তাঁকে বারান্দায় নিয়ে এলেন। খানকয়েক বেতের চেয়ার ছিল সেখানে। নিজে একটায় বসে বন্ধুকেও বসালেন। বললেন: কিছু খাবে?

হীরেনবাবু বললেন: তুমি তো চা কফি খাবে, আর চুরুট। ওর একটাও আমার চলবে না।

তাহলে তুমি একটু ফলের রস খাও।

বলে লতিফকে সেই হুকুম দিলেন।

হীরেনবাবু এই বারে কাজের কথায় এলেন, বললেন: মেয়ে ফিরেছে?

ঘোষাল সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে কি, এখনই সে ফিরবে কেন!

হীরেনবাবু বললেন: পাঁচটা তো বেজে গেছে! অফিস থেকে কি সে বাড়ি ফেরে না?

ঘোষাল সাহেব বললেন: কোন পার্টি-ফার্টি থাকলে ফেরে, চেঞ্জ হয়ে আবার বেরিয়ে যায়।

তা না থাকলে—

সোজা ক্লাবে।

বিকেলে জলখাবার খায় না?

ঘোষাল সাহেব হেসে বললেন: কলকাতা শহরে জলখাবার খেতে কি কেউ বাড়ি আসে, না বাড়ির জলখাবার কারও ভাল লাগে!

হীরেনবাবু বললেন: হোটেল রেস্তোরাঁয় খেতে তো অনেক পয়সা লাগে শুনেছি!

তা লাগে। তবে বাড়ি যাতায়াতের জন্যে পেট্রলের খরচ আরও বেশি লাগত! কিন্তু—

ঘোষাল সাহেব থামতেই হীরেনবাবু বললেন: থামলে কেন, বল।

ঘোষাল সাহেব এবারে দ্বিধা না করে বললেন: এ কালের ছেলেমেয়েরা অবশ্য খরচের কথা ভাবে না। খরচ সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই।

হীরেনবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন: আজ না হয় তুমি আছ, কিন্তু চিরদিন তো তুমি থাকবে না! তখন তো তাকেই সব দিক সামলাতে হবে। হিসেব করে খরচপত্র না করলে—

ঘোষাল সাহেব হেসে বললেন: আমার অবস্থাও ঠিক তোমারই মতো। তুমি ছাত্রদের কথা ভাবছ, আর আমি মেয়ের কথা।

হীরেনবাবু দুঃখিত ভাবে বললেন: তোমারও যে ভাবনা আছে, জানতুম না। আমি ভাবতুম, বেশ সুখে আছ তুমি।

লতিফ একটা তিপায়ের উপরে কফি আর ফলের রস দিয়ে গেল। ঘোষাল সাহেব তাঁর পেয়ালাটি হাতে নিয়ে বললেন: খেয়ে নাও, রস গরম হয়ে যাবে।

হীরেনবাবু বলে উঠলেন: ঠাণ্ডা রস দিয়েছে বুঝি! তা একটু গরম হোক। তোমার গরম পেয়ালাটা তুমি শেষ কর।

লতিফ এসেছিল চুরুটের বাক্স দিতে।' বলল: ফ্রিজের ঠাণ্ডা রস দিই নি হুজুর, তাজা রস দিয়েছি।

হীরেনবাবু খুশী হয়ে বললেন: তুমি যে ভুল করবে না, তা আমি জানতুম।

বলে গ্লাসটি হাতে তুলে নিলেন।

সাত্যকির পাণ্ডুলিপিটা তিনি কোলের উপরে রেখেছিলেন। তাই দেখে ঘোষাল সাহেব বললেন: ওটা নামিয়ে রাখছ না কেন?

এটা!

বলে হীরেনবাবু তার উপরে হাত বুলিয়ে বললেন: ছেলেটা যক্ষের ধনের মতো এখানা আগলে রেখেছিল। কাউকে দেব বললে সে আমাকেও দিত না। কী করতে নিয়ে যাচ্ছি জিজ্ঞেস করলে মহা ফাঁপরে পড়ে যেতুম। মিথ্যে কথাও বলতে পারতুম না। আর সত্যি কথা বললে সে বেঁকে বসত।

বেঁকে বসত কেন ?

ছেলেদের মন মেজাজ বোঝা ভারি মুশকিল ভাই। নিতান্ত বেহিসেবী তারা। নিজেদের ভালমন্দও তারা বুঝতে চায় না।

ঘোষাল সাহেব বললেন : ওর পুরো নামটা কী বলেছিলে ?

সাত্যকি ভট্টাচার্য।

ভট্টাচার্য !

বলে ঘোষাল সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

হীরেনবাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন : ভট্টাচার্য নাম শুনে তোমার মুখখানা বেঁকে গেল কেন ?

ঘোষাল সাহেব বললেন : সাহিত্য জিনিসটা চক্রবর্তী ভট্‌চায্যি বামুনের কম্ম নয়। চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে হলে হত।

হীরেনবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন : কী বলছ তুমি ?

ঠিকই বলছি। তোমাদের সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজে দেখ, আমি সত্যি বলছি কি না তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। ওকে একটা ছদ্মনাম নিতে বল।

ছদ্মনাম !

হ্যাঁ হে, ছদ্মনাম। তোমাদের বলাই মুখুজ্জেও তো বড় লেখক বলে শুনেছি। তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন কেন ! ইতিহাস মানতেন বলেই তো ছদ্মনাম নিয়েছিলেন ! আর তা নিয়ে যে কাজের কাজ করেছিলেন, তাও বুঝতে পারছ ! পদ্মভূষণও পেয়ে গেলেন দেখলুম।

তারপরেই তিনি অন্য কথায় চলে গেলেন, বললেন : কিন্তু যাই বল, তোমাদের সরকারের এই সব টাইটেল তেমন জুতসই হয় নি। নামের আগে লিখলে তেমন মানায় না। আমাদের সময় কেউ একটা স্যর টাইটেল পেলে রাতারাতি লোকটার দাম পালটে যেত। মানে সম্মানে—

হীরেনবাবু তাঁর মুখটা বেঁকিয়ে বললেন : কিন্তু লেখকেরা এ সবের কদর কোন দিনও দেয় নি।

কী রকম ?

রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন মনে আছে ?

আরে, তোমার রবিঠাকুর একটাই জন্মেছে। সারা বিশ্বের লোক যাকে সম্মান দিয়েছে, ইংরেজের সম্মানের তার কতটুকু দরকার ছিল! টাইটেল ফিরিয়ে দিয়েই বরং দেশের লোকের কাছে বেশি সম্মান পেয়েছিলেন।

হীরেনবাবু এ কথা মেনে নিয়ে বললেন : তা সত্যি।

ঘোষাল সাহেব খুশী হলেন এই সমর্থন পেয়ে। বললেন : তোমার ছাত্রকে কথাটা বুঝিয়ে বল। যদি লেখক হবার ইচ্ছা থাকে তো একটা ছদ্মনাম নেবার প্রয়োজনের কথা সীরিয়াস্‌লি ভেবে দেখতে বল।

হীরেনবাবু এবারে চটে উঠলেন। বললেন : কিন্তু তোমার কাছে আমি এ পরামর্শের জন্যে আসি নি। আমি এসেছি এই পাণ্ডুলিপিটা তোমার মেয়ের হাতে দিতে, বুঝলে! কতক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তাই বল।

ঘোষাল সাহেবও রেগে গেলেন। বললেন : এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন!

তবে কি পাড়ার লোককে জিজ্ঞেস করব ?

এ কথা যদি আমি বলতেই পারব তো মেয়ের জন্যে আমার দুর্ভাবনা ছিল কী!

হীরেনবাবুর হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল। আর পরক্ষণেই সহানুভূতির সুরে বললেন : ঠিক বলেছ। তাহলে এখন কী করি বল তো!

ঘোষাল সাহেবও নরম হয়ে বললেন : আর একটু বোসো। অফিস থেকে সোজা ক্লাবে না গেলে শাশ্বতী এখুনি এসে পড়বে। তুমি নিজেই এটা তার হাতে দিও।

হীরেনবাবু খুশী হয়ে বললেন : ঠিক বলেছ।

শাশ্বতী যে এ সময়ে আসবে ঘোষাল সাহেব তা আশা করেন

নি। তাই গাড়ি নিয়ে শাশ্বতীকে ফিরতে দেখে নিজেই আশ্চর্য হলেন বেশি। কিন্তু হীরেনবাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। পোর্টিকোয় এসে গাড়ি থেকে নামতেই হীরেনবাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন : তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি মা।

শাশ্বতী আশ্চর্য হয়ে বলল : আমার জন্যে!

হীরেনবাবু বললেন : সকালবেলার কথা মনে নেই? সেই নাটকটি এনেছি। চমৎকার নাটক! এ রকম নাটক তোমরা পাবে না।

সত্যি!

বলে শাশ্বতী পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিল।

ঘোষাল সাহেব বললেন : তোমরা কি কিছু ঠিক করেছ।

শাশ্বতী বলল : কয়েকটা নাটকের নাম পাওয়া গেছে—অয়দিপাউস, ডল্‌স্ হাউস্, ওয়েটিং ফর গোদো—এ সবের বাংলা অনুবাদ আছে।

হীরেনবাবু বলে উঠলেন : ছি ছি! মৌলিক বাংলা নাটক থাকতে তোমরা বিদেশী নাটকের অনুবাদ পছন্দ করবে!

শাশ্বতী বলল : এখনও কিছু ঠিক হয় নি জ্যাঠামশাই! আজ ক্লাবে আমরা নাটক সিলেকসনে বসব। আপনি সময় মতো এটা দিয়ে ভালই করেছেন।

বলে আর অপেক্ষা করল না। তরতর করে উপরে উঠে গেল।

* * *

রাতে শাশ্বতী ক্লান্ত শরীরে ফিরল। এ ক্লান্তি যে দেহের নয়, শাশ্বতী সে কথা বোঝে। এ ক্লান্তি মনের। কৃষ্ণা মিত্র নামে একটা কালো মেয়ের কাছে সুজিত আজ হেরে গেছে। কৃষ্ণা হারিয়ে দিয়েছে সুজিতকে। সুজিতকে হারাবার জন্যে সে বোধহয় আজ বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছিল। কিন্তু এর আগে কৃষ্ণা মিত্রকে সে কোনদিন এমন করে কথা বলতে দেখে নি।

'মানুষের ক্ষুধা'র পাণ্ডুলিপিটা শাশ্বতী সুজিতের হাতেই দিয়েছিল।

আর সুজিত তা ফেলে রেখেছিল টেবিলের উপরে। নাটক বাছাই নিয়ে ক্লাবের সভ্যরা যখন নিজেদের মতামত জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করছিল, কৃষ্ণা তখন পাতা উল্‌টে দেখছিল সেই পাণ্ডুলিপিটার। শাশ্বতীর মনে পড়ছে, সে তার ঠোঁটে একরকমের হাসি দেখতে পেয়েছিল। মনে হয়েছিল তা বিদ্রূপের হাসি। নাটক যে তার পছন্দ হচ্ছে না, সে তা বুঝতে পেরেছিল।

কিন্তু সুজিত যখন তার মত জানতে চাইল, তখন সে বলল: এই নাটকটাই সব চেয়ে উপযোগী হবে।

কেন?

বলে সুজিত তার দিকে তাকাল।

কৃষ্ণা বলল: খুব সময়োপযোগী নাটক। যে দুর্ভিক্ষের জন্যে আমরা টাকা তুলতে চাইছি, এতে দেখছি সেই দুর্ভিক্ষের সময়েরই ঘটনা। আর তা ছাড়া নাটকের অভিনয়ে খরচ বিশেষ কিছুই হবে না, প্রায় পুরো টাকাটাই আমরা দুর্ভিক্ষের জন্যে দিতে পারব।

সুজিত জিজ্ঞেস করেছিল: নাচ গান আছে?

না।

তবে চলবে না।

আর কৃষ্ণা বলেছিল: সেই জন্যেই চলবে।

এই নিয়েই তর্কাতর্কি হল। শেষ পর্যন্ত কলহ। বেশির ভাগ সভ্য কৃষ্ণা মিত্রের দিকে ঝুঁকল বলেই সুজিত হেরে গেল। বলল: ঠিক আছে সবাই যখন এই নাটকের পক্ষে, তখন এই নাটকই হবে। কিন্তু আমি একফালি ছেঁড়া কাপড় পরে খালি গায়ে নায়কের পার্টে নামতে পারব না।

শাশ্বতী ভেবেছিল, সে নিজে এই কথা বলবে। কিন্তু সুজিত আগে বলে ফেলার জন্যে অসুবিধায় পড়ে গেল। তার আগেই কৃষ্ণা মিত্র তার দিকে চেয়ে বলল: তুমিও বল, ছেঁড়া শাড়ি পরে স্টেজে নামলে তোমারও মান যাবে!

শাশ্বতীকে তাই ভিন্ন পথ ধরতে হল, বলল : নাটকটা যে আমি এনেছি তা তোমরা ভুলে যাচ্ছ।

সুজিত আর বাধা দিল না, বলল : তোমাদের নাট্যকারকেই তাহলে নায়কের পার্টটা দাও। সেই রিহার্সল পরিচালনা করুক।

বলে নিজের বইগুলো সব গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। আর কৃষ্ণা যে তার দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসল শাশ্বতীর দৃষ্টি তা এড়াল না। অন্য দিনের মতো সুজিত তাকে সঙ্গে যাবার জন্য ডাকল না। একাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর তার এই বিরাগ দেখে আশ্চর্য হল সবাই।

শাশ্বতীকে আজ খানিকক্ষণ অভিনয় করতে হয়েছিল। তার নিজের মত যে সকলের চেয়ে বড়, সেটা বোঝাবার জন্যেই অভিনয়। বলেছিল : নাটকটা সময়োপযোগী হবে বলেই আমি সংগ্রহ করে এনেছিলাম। কিন্তু আমরা যদি নায়কের অভিনয় করতে না পারি তাহলে আমাদেরই অপমান। লেখককে ডেকে আনার কথায় আমি সায় দিতে পারছি নে।

বলে শাশ্বতী কয়েকজন পুরুষ সভ্যের দিকে একে একে তাকিয়েছিল। আনন্দ আঁতকে উঠে বলেছিল : ও বাবা, আমার দ্বারা ও সব হবে না।

কৃষ্ণা বলল : নাটকটা লিখেছেন কে ?

শাশ্বতী বলল : আমি তাকে চিনি নে।

সে কি !

এক বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে এই পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। তাঁর এক ছাত্রের লেখা।

স্কুলের ছাত্র নিশ্চয়ই নয় !

বোধহয় কলেজেরও নয়।

কেন ?

যে ভদ্রলোকের ছাত্র, তিনি অনেকদিন আগেই রিটায়ার করেছেন।

আনন্দ বলে উঠল: তাহলে কাল তাকে ধরে আনুন। তার হাতেই ভারটা দিয়ে দেওয়া যাক।

শাশ্বতী ভাবছিল, তা সম্ভব কি না। কিন্তু তাকে নীরব দেখে কৃষ্ণা বলে উঠল: পরামর্শটা পছন্দ হল না তো! সত্যিই, সুজিত নায়ক হলে যেমন মানাত—

কৃষ্ণার কথায় বিদ্রূপটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই শাশ্বতী আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বলল: ঠিক আছে। এই রিহার্সলের ভার আমিই নিচ্ছি।

ক্লাব থেকে শাশ্বতী আজ সোজা বাড়ি ফিরল। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে ক্লান্ত মনে হল তার। এখন আর কিছু ভাল লাগছে না। এখন শুয়ে পড়তে পারলেই যেন সে বেঁচে যায়।

ঘোষাল সাহেব লিভিং-রুমে বসে বই পড়ছিলেন। মেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরেছে দেখে তিনি খুশী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শাশ্বতী এসে তাঁর কাছে বসল না। দরজা থেকেই জিজ্ঞাসা করল: তুমি খেয়ে নিয়েছ বাবা?

ঘোষাল সাহেব 'হ্যাঁ' বলতেই শাশ্বতী এগিয়ে গেল। শাশ্বতী নিজে খেয়ে এসেছে কি না সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সময় তিনি পেলেন না। লতিফ বুঝতে পেরেছিল যে শাশ্বতী আজ খেয়ে আসে নি, তাই খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু শাশ্বতীর আজ খাবার স্পৃহা ছিল না। বলল: শুধু সুইট ডিশ আর জল।

বলে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল।

ক্লান্ত শাশ্বতীর আজ খাবার ইচ্ছা নেই। অফিসে আজ তার অনেক পরিশ্রম হয়েছিল। কিন্তু এতটা ক্লান্ত সে হয় নি। বাড়ি এসে অফিসের সাজ বদলে ক্লাবে গিয়েছিল। ভেবেছিল, আজকের সন্ধ্যেটা তার ভাল কাটবে। কিন্তু যা ভেবেছিল, তা হল না। সবই কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সুজিত হেরে গেল, তাকে হারিয়ে দিল কৃষ্ণা মিত্রের মতো একজন সাধারণ মেয়ে। আর শাশ্বতী

তাকে রক্ষা করতে পারল না, পারল না কৃষ্ণা মিত্রকে হারিয়ে দিতে।

শাশ্বতী তার ঘরের সোফায় বসেছিল। লতিফ দরজায় টোকা দিতেই বলল ঃ এসো।

লতিফ একটু বেশি করে পুডিং এনেছিল। শাশ্বতী তার খানিকটা খেল। তারপর ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিল এক গ্লাস। লতিফ আর একটা গ্লাস বেড সাইড টেবলে ঢেকে রেখে বেরিয়ে গেল।

শাশ্বতী দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আজ তার কিছু ভাল লাগছে না। আজ সে আর কিছু ভাববে না। সে আজ ঘুমোতে চায়। কোন ভাবনাকেই আজ সে প্রশ্রয় দেবে না।

কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল যে মন বড় বেয়াড়া। কিছু ভাববে না বলেই যেন মন নানারকম ভাবনাকে ডেকে আনছে। শাশ্বতী তার এই অবাধ্য মনের সঙ্গে খানিকক্ষণ লড়াই করল। তারপরে ব্যর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করল। হালকা হাওয়ায় ভেসে মন তার উড়ে গেল ইতালির এক সমুদ্রবেলায়।

সুজিতের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল বছর তিনেক আগে। কিন্তু সে সুজিত যেন আজকের সুজিত নয়। কত প্রগ্রেসিভ ছিল সে, কত রকমের আইডিয়া ছিল তার। আর এই জন্যেই তো তাকে তার ভাল লেগেছিল ; কত ছেলের সঙ্গেই তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে কিন্তু কারও সঙ্গেই সে এমন অন্তরঙ্গ হয় নি। শাশ্বতীর সেদিন বিশ্বাস হয়েছিল যে সুজিতের মধ্যে অনেক প্রমিস আছে, একদিন সে অনেক বড় হবে।

অক্সফোর্ডের পড়া তখনও তার শেষ হয় নি। ছুটিতে সে বেড়াতে বেরিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। সোফিয়া তাকে ক্যাপ্রির কথা বলেছিল। নেপল্‌সের কাছে এই দ্বীপটি নাকি টুরিস্টদের স্বর্গ হয়ে উঠেছে। শাশ্বতী বলেছিল ঃ আর সেটা চিরকাল স্বর্গ হয়েই আছে। সে জায়গা কী দোষ করল ?

শাশ্বতীর নাম তার অনেক বন্ধুই উচ্চারণ করতে পারত না।

নানা রকমের অদ্ভুত উচ্চারণ করত তারা। আর শাশ্বতীর রাগ হত। শেষ পর্যন্ত তারাই নামটা সংক্ষেপ করে সোয়াতি করেছিল। ইংরেজী বানানের শেষ অংশটুকুর শুদ্ধ উচ্চারণ তার মুখে শুনে অনেকে তাকে সতী বলতেও চেয়েছিল। কিন্তু শাশ্বতী রাজী হয় নি। বলেছিল, ও নামের একটা মানে আছে, সেটা সারাক্ষণ আমার বিবেককে খোঁচা দেবে।

মানেটা জানতে চেয়েছিল তার বন্ধুরা। আর মানে শুনে হেসে উঠেছিল। সোফিয়াই বলেছিল: রিডিকুলাস। এই সব কথা শুনলে তার হাসি পায়। কী প্রিমিটিভ আইডিয়া!

তারপরে বন্ধুরা ক্রমশঃ শাশ্বতীর সোয়াতি নামটাই চালু করে দিয়েছিল।

জেন শাশ্বতীর কথা শুনে বলেছিল: তুমি কি ফ্রান্সের রিভিয়েরার কথা বলছ সোয়াতি?

শাশ্বতী বলেছিল: হ্যাঁ।

জেন পুলকিত হয়ে বলেছিল: স্প্লেণ্ডিড্! সেবারে আমি দেখে এসেছি।

আর সোফিয়া তার ঠোঁট উলটে বলেছিল: বাই জোভ্! কী পছন্দ তোমাদের!

কেন?

বলে শাশ্বতী সোফিয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আর সোফিয়া উত্তর দিয়েছিল: আজ কুইন অব ইংলণ্ড যদি তোমাদের ব্যাঙ্কোয়েটে ইন্‌ভাইট করে, তোমরা যাবে?

জেন লাফিয়ে বলে উঠল: নিশ্চয়ই যাব।

হোয়াট্!

এ রকম অপর্চুনিটি আমি কিছুতেই মিস্ করব না।

সোফিয়া হতাশ ভাবে বলল: ইউ কল্ ইট অ্যান অপর্চুনিটি! ও শেম!

হোয়াই! হোয়াই নট?

বলে সোফিয়াকে আক্রমণ করেছিল জেন। আর সোফিয়া তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ঃ এ রকম একটা ফর্মাল ব্যাপারে আনন্দের চেয়ে দুর্ভাবনাই হয় বেশি। কাজেই আনন্দ পেতে হলে রিভিয়েরা নয়, ক্যাপ্রির মতো জায়গাই ভাল।

শেষ পর্যন্ত সোফিয়ারই জিত হয়েছিল। রিভিয়েরার বদলে তারা ক্যাপ্রিতেই এসেছিল। লণ্ডন থেকে রোমে এসেছিল উড়ে। সেখান থেকে ট্রেনে নেপ্‌ল্‌স্‌ দেখে ক্যাপ্রি। বে অফ্‌ নেপ্‌ল্‌সের উপর নেপ্‌ল্‌স্‌ শহর, আর এই উপসাগরেই ক্যাপ্রি একটি সুন্দর দ্বীপ। শাশ্বতীরা এখানে কয়েকদিন কাটিয়েছিল মনের আনন্দে।

কিন্তু ক্যাপ্রির কথা সহসা কেন মনে এল! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তখন তার বয়স তিন বছর কম ছিল। আর তার চেয়েও যা কম ছিল, তা তার ওজন। শাশ্বতীর এই দেহটা তখন অনেক হালকা ছিল। আর গায়ের রঙ আরও ফর্সা। প্রসন্ন আলোয় যেদিন প্রথম স্নান করতে এসেছিল সমুদ্রবেলায়, সেদিন নিজের দিকে তাকিয়েই সে আশ্চর্য হয়েছিল বেশি। সোফিয়াও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। বলেছিল, ক্যাপ্রি না হয়ে এ জায়গা ক্যালিফোর্ণিয়া হলে আজ তোমাকে ইলোপ করে নিয়ে যেত।

কে ?

বলে শাশ্বতী তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

সোফিয়া বলেছিল ঃ কে আবার। হলিউডের কোন শাঁসালো প্রডিউসার!

অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে শাশ্বতী বলেছিল ঃ নট্‌ ইণ্টারেস্টেড্‌।

তবে কি কোন ফিল্ম্‌ স্টার চাই ? কাকে পছন্দ ?

কিন্তু সেই পছন্দের কথা বলবার আগেই শাশ্বতী একজন যুবককে কাছে আসতে দেখেছিল। না, স্নানের পোশাকে নয়, হালকা একটা স্যুট পরে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে আসছিল। ময়লা তার গায়ের রঙ, ফর্সা ভারতীয়ের মতো। কিন্তু চোখে লাগবার মতো লম্বা।

ছেলেটা এই দিকেই আসছিল। কিন্তু কালো চশমা পরে কোন্ দিকে তাকিয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না।

শাশ্বতীর হাত টেনে ধরে সোফিয়া বলল : লাইক্ হিম ?

শাশ্বতী দৃষ্টি দিয়ে ভৎর্সনা করল তাকে।

লোকটা আরও কাছে এলে সোফিয়া বলল : তোমার দেশের লোক নয় তো ?

কিন্তু শাশ্বতী তাকে দূরে টেনে নিয়ে গেল। বলল, বড্ড বাজে বকো তুমি।

সোফিয়া মেনে নিল তার কথা, বলল, তা একটু বকি। কিন্তু ছেলেটা আমাদের দিকে নজর রেখেছে, ফিরে ফিরে দেখছে আমাদের।

শাশ্বতী বলল : তাতেই কি প্রমাণ হচ্ছে সে ভারতীয় ?

সোফিয়া কৌতুকের সুরে বলল : রাগ কোরো না। ভারতীয় যুবকেরা বিদেশী মেয়েদের সম্বন্ধে একটু বেশী কৌতূহলী। বিশেষ করে সমুদ্রের ধারে তারা যেন মেয়ে দেখতেই আসে। পকেটে বাইনোকুলার নিয়েও আসে অনেক সময়। লুকিয়ে দেখে, আর সুযোগ পেলে ছবিও তোলে।

বালির উপরে শাশ্বতী শুয়ে পড়েছিল। বলল : বেশ করে।

কিন্তু তুমি রাগ করছ কেন ! তুমি তো পুরুষ মানুষ নও !

বলে সোফিয়াও তার পাশে শুয়ে পড়ল।

শাশ্বতী বলল : ভারতীয়দের সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো ?

সোফিয়া হেসে বলল : তোমার চেয়ে অনেক বেশী !

তার মানে ?

তোমার তো জন্ম হয়েছে বিদেশে, বিদেশেই এত বড় হয়েছ। ক'বার ভারতবর্ষে গেছ, আর কী দেখেছ ভারতবর্ষের !

বলে সোফিয়া তার মুখের দিকে তাকাল।

শাশ্বতী এর উত্তর না দিয়ে বলল : তোমার অভিজ্ঞতার কথা বল।

সোফিয়া দুষ্টু মেয়ের মতো হেসে বলল : বলব না।

তারপরে আরও একটু হেসে বলল : আমি প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম একটা ভারতীয় ছেলের।

সত্যি !

বলে শাশ্বতী উঠে বসল। প্রবল কৌতূহল তার চোখে মুখে।

সোফিয়া তার হাত ধরে টেনে আবার তাকে বালির উপরে শুইয়ে দিল। বলল : ছেলেটা এখনও তোমাকে দেখছে।

দেখুক।

তারপরেই বলল : তোমার প্রেমে পড়ার গল্পটা বল তো শুনি !

সোফিয়া গম্ভীর হয়ে বলল : সব কথাই তোমাকে বলব কেন ?

প্লিজ সোফিয়া, আজ এ গল্পটা বল।

সোফিয়ার সেই প্রেমের গল্পের ভূমিকাটি শাশ্বতীর এখনও মনে আছে। সোফিয়া বলেছিল : ছেলেদের সম্বন্ধে প্রেম করার ব্যাপারে খুব সাবধান। কুকুরের মতো দূরে রাখবে তাদের, বিশেষ করে বিদেশী ছেলে হলে। তারা প্রেম করতে আসে না, আসে মজা লুটতে। আর তার পরই ফুড়ুৎ।

শাশ্বতী বলে উঠল : সিলি !

কেন ?

গ্র্যাণ্ড্-মা'র মতো কথা বলছ।

নেভার।

আমি তোমাকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

এক্স্পীরিয়ান্স্ ?

বলে শাশ্বতী একটা অবজ্ঞার হাসি হাসল।

সোফিয়া বলল : বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?

তারপরেই বলল : হবে। একবার প্রেমে পড়েই গ্র্যাণ্ড্-মা হয়ে যাবে। আর কাউকে কিছু শেখাতে হবে না।

প্রেমের গল্পটা ফস্কে যাচ্ছে ভেবে শাশ্বতী বলেছিল : সেই ভারতীয় ছেলেটার কথা বল।

সোফিয়া বলল : বিলীভ্ মী, ছেলেটাকে আমি পোয়েট মনে করেছিলাম। ইলিয়টের অনেক কবিতা জানত, আরও সব এলোমেলো কবিতা। আমি ভাবতাম, সে সবই তার নিজের লেখা। আর ইণ্ডিয়া তো টেগোরের দেশ। কয়েক দিন যেতে না যেতেই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলাম।

তারপর ?

তারপরে যেই বুঝতে পারল যে আমি তার প্রেমে পড়েছি, অমনি সেই আবদার—

আর তুমি রাজী হয়ে গেলে ?

রাজী ! হোয়াট্ ননসেন্স্ !

শাশ্বতী বলল : তুমি কী করলে ?

আমি ভাবলাম, এ কেমন কবি ! যারা ছবি আঁকে, তাদের কথাও শুনেছি, দিনের পর দিন তারা ন্যুড মেয়েকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকে, কিন্তু কোন দিন তো আর্টিস্ট তার মডেলকে বিছানায় টানে না !

শাশ্বতী বলল : তবে কি পালিয়ে এলে তুমি ?

সোফিয়া বলল : সেই থেকেই ভয় পাই ভারতীয় ছেলেকে !

তারপরেই চমকে উঠেছিল দুজনে। পিছনে শুধু পায়ের শব্দ নয়, গলার শব্দ পেয়েছিল। ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল সেই যুবকটিকে। হেসে বলল : ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইণ্ডিয়ানস ? আমি ইণ্ডিয়ান, সুজিত বাসু আমার নাম।

ত্রস্ত ভাবে দুজনে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সোফিয়া হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সুজিতের দিকে। কিন্তু শাশ্বতী হাত বাড়ায় নি। তবে ভদ্রতার জন্যে নামটা বলেছিল : শাশ্বতী ঘোষাল।

দু'হাত জুড়ে সুজিত তাকে সেদিন নমস্কার করেছিল।

সেই প্রথম দেখা। প্রথম পরিচয়। কিন্তু এক দিনেই সে যেন অনেক কাছাকাছি এসে গেল। সুজিতের কথাগুলো শাশ্বতীর আজও মনে আছে। সুজিত বলেছিল : তোমাদের ডিস্টার্ব করলাম তো খুব !

তার উত্তরটা সোফিয়া দিয়েছিল, বলেছিল ঃ মোটেই না। আমরা তো এখানে সময় কাটাতে এসেছি!

সুজিত বলেছিল ঃ এখানে না এলে জানতেই পারতাম না যে ইতালিতে এমন সুন্দর একটা জায়গা আছে।

খুশি হয়েছিল সোফিয়া। বলেছিল ঃ তুমিও তাই বলছ! কিন্তু এরা যেতে চেয়েছিল রিভিয়েরায়।

এরা!

বলে সুজিত চারিদিকে তাকিয়েছিল। ভেবেছিল, বোধহয় আরও অনেক মেয়ে আছে কাছে। কিন্তু আর কাউকে না দেখে শাশ্বতীকে বলেছিল ঃ তোমার বুঝি এ জায়গাটা ভাল লাগছে না!

ইংরেজীতে কথা, তাই 'তুমি' 'আপনির' বালাই নেই।

শাশ্বতী বলেছিল ঃ তোমার মতো আমারও কিছু জানা ছিল না।

সুজিত বলল ঃ তাই বল। এর পরে আর বোধহয় রিভিয়েরায় যেতে চাইবে না!

শাশ্বতী বলেছিল ঃ একবার যেতেই হবে।

কেন?

বলে সোফিয়া তাকিয়েছিল শাশ্বতীর দিকে।

শাশ্বতী বলেছিল ঃ নিজে না দেখলে বুঝব কী করে, কোন্ জায়গাটা ভাল!

সুজিত বলেছিল, অনুমতি দিলে আমিও সঙ্গে যেতে পারি।

শাশ্বতী লজ্জা পেয়েছিল এই প্রস্তাব শুনে। তার চোখ মুখ নিশ্চয়ই রাঙা হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। এই লজ্জার একটা কারণ ছিল। একটু আগে ভারতীয় ছেলের সম্বন্ধে সোফিয়া যা বলেছিল, শাশ্বতী তা ভুলতে পারে নি। তার মনে হল যে, দেখা হতে না হতেই এই রকম একটা প্রস্তাব করে সুজিত নিজেকেই খেলো করল অনেকটা। এর পরে সোফিয়া হয়তো বলবে, দেখলে তো তোমাদের দেশের ছেলেকে! মেয়েদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে আসে, সঙ্গে যেতে চায় যেচে। পুরুষ আকর্ষণ করবে মেয়েদের, তা নয় তো তারা

কি ফেউয়ের মতো পিছনে লাগবে! শাশ্বতী তাই উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিল। বলেছিল : এবার তো আমরা রিভিয়েরায় যাব না!

সুজিতও বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। তাই সামলে নিয়ে বলেছিল : আমিও এখন যেতে পারব না। আমার কাজ আছে এই দিকে।

তারপরে পরিচয় দিয়েছিল নিজের। ইণ্ডিয়ায় সে একটা ইতালিয়ান ফার্মে চাকরি নিয়েছে। তারাই তাকে এখানে কাজ শিখতে পাঠিয়েছে। ছুটিতে সে দেখে বেড়াচ্ছে ইতালি। নেপ্‌ল্‌সে এসেছিল ভিসুভিয়াস দেখতে, ভূগোলে পড়া সেই বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। আজ এইখানে চলে এসেছে।

সোফিয়া জিজ্ঞাসা করল : ভিসুভিয়াসের মাথায় উঠেছিলে?

আশ্চর্য হয়ে শাশ্বতী বলেছিল : ওর মাথায় ওঠা যায় বুঝি!

সোফিয়া বলেছিল : যাবে না কেন! টুরিস্টরা তো ওর মাথায় উঠতেই ওখানে যায়। তার বিরাট ক্রেটারের ওপরে হেঁটে বেড়ায়।

ভয় করে না?

বলে শাশ্বতী সুজিতের মুখের দিকে তাকাল।

সুজিত বলল : ভয় কিসের! ভিসুভিয়াস তো এখন মরা আগ্নেয়গিরি!

শাশ্বতী বলল : তাহলে আমরা ওপরে উঠলাম না কেন! তুমি উঠেছ?

বলে সে সুজিতের দিকে তাকাল।

সুজিত একটু লজ্জিত হয়ে বলল : ফেরার পথে উঠব ভেবেছি।

সোফিয়া বলল : সাবধান, একা উঠবার চেষ্টা করো না। পথ হারিয়ে ফেলতে পারো, আর বিপদেও পড়তে পারো। তাই গাইড নিয়ো সঙ্গে। ওরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ভিসুভিয়াসের নামেই পম্পাই-এর ধ্বংসস্তূপের কথা উঠে পড়ল।

সুজিত এ জায়গাটা দেখে নি। নেপ্‌লস্‌ থেকে মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। কিন্তু সেখানে গিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এমন বিশাল ধ্বংসস্তূপ পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় নেই।

সোফিয়া জিজ্ঞাসা করল : পম্পাই দেখলে না কেন ?

এবারেও সুজিত বলল : ফেরার পথে দেখব ভেবেছি।

সোফিয়া বলল, যদি সময় থাকে তো আরও দু' ঘণ্টার পথ এগিয়ে যেও। সোরেন্তো আর পথিতানো দেখবে আর পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করা অমলফি ড্রাইভ। এই ড্রাইভ থেকে বে অফ্‌ নেপ্‌ল্‌সের চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাবে, আর তারই ধারে ধারে দেখবে জেলেদের ছোট ছোট গ্রাম। নেপ্‌ল্‌সে এলে এই সব দৃশ্য না দেখে কেউ ফেরে না।

সুজিত আশ্চর্য হল এই কথা শুনে। স্বীকার করল যে সে এ সবের কিছুই জানে না। জানলে এখানে আসবার আগে ওসব দেখেই আসত।

সোফিয়া বলল : ফেরার পথেও দেখতে পার।

নিশ্চয়ই দেখব।

বলে সে শাশ্বতীর দিকে তাকাল।

শাশ্বতী বলল : তুমি আমাদের তো এ সব কথা বল নি !

তার উত্তর না দিয়ে সোফিয়া হাসল।

সুজিত এবারে তার কৌতূহল দমন করতে পারল না। বলল : তোমাদের সঙ্গে আর কে আছে ?

সোফিয়া বলল : জেন।

তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না !

বলে শাশ্বতীর দিকে তাকাল।

শাশ্বতী বলল : সে তার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে ব্লু গ্রোত্তো।

তোমরা গেলে না কেন ?

সোফিয়া হেসে বলল : আমরা তাদের ডিস্টার্ব করব কেন !

বুঝেছি।

বলে সুজিত হেসেছিল নির্মল আনন্দে। তারপর বলেছিল: তোমাদের বুঝি বন্ধু নেই!

সোফিয়া বলল: না।

আর শাশ্বতী বলল: এই তো আমরা দুই বন্ধুতে বেশ আছি।

সুজিত বলল: দলে আর একজন বন্ধু নিতে কি তোমাদের আপত্তি হবে?

সোফিয়া শাশ্বতীর দিকে তাকাল। কিন্তু শাশ্বতী কোন উত্তর দিল না।

সুজিত তার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে জোর করল না। আর বলার মতো কোন কথাও বুঝি খুঁজে পেল না। তাই বলল: তোমাদের আর বিরক্ত করব না। তবে একটা অনুরোধ ছিল। যদি রাখ তো বলি।

সোফিয়া বলল: বেশ লোক তো! কী অনুরোধ না জেনেই আমরা রাজী হয়ে যাব!

আমার সঙ্গে আজ লাঞ্চ খাবে তোমরা। আমি তোমাদের জন্যে মর্গালো তাইবোরিওতে অপেক্ষা করব।

সোফিয়া চোখ বড় বড় করে তাকাল শাশ্বতীর দিকে।

এবারেও শাশ্বতী কোন উত্তর দিল না।

সুজিত বলল: তাহলে ঐ কথাই রইল। আমি তোমাদের জন্যে ওখানেই অপেক্ষা করব।

শাশ্বতী না বলতে পারল না। আর সোফিয়া বলল: আমরা কিন্তু তোমাকে খুব জ্বালাতন করব!

বেশ তো!

বলে সুজিত বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

সেদিন সুজিতের পায়ে দড়ির সোলের জুতো দেখেছিল শাশ্বতী। আর তাকে আশ্চর্য হতে দেখে সোফিয়া বলেছিল: আশ্চর্য হচ্ছ কেন! এই জুতো ও এখানেই কিনেছে। হয়তো ফিশিং শার্টও কিনবে। এখানকার বাজারে একদিন তোমাকে নিয়ে যাব। সুতোর স্কার্ট

আর স্কার্ফ তোমার পছন্দ হবে। ক্যাপ্রি থেকে লোকে এই সব কিনে নিয়ে যায়।

শাশ্বতী অশ্চর্য হয়ে বলল : তুমি এতো কথা জানলে কোথায় ?

সোফিয়া তার উত্তর না দিয়ে বলল : ভাল কথা পল ফন্ হেইসের লে আরাবিত্তা পড়েছ ?

না।

ইস্, আগে বল নি কেন ? আমি তাহলে অক্সফোর্ডেই তোমাকে পড়তে দিতাম ! এই ক্যাপ্রির জেলেদের নিয়ে ভারি চমৎকার উপন্যাস। জেলেদের গ্রামে বুড়ো-বুড়ীরা জাল বুনছে আর মেরামত করছে পুরনো ছেঁড়া জাল। শক্তসমর্থ ছেলেরা অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে যাচ্ছে মাছ ধরতে বে অফ নেপ্‌ল্‌সে। ভিসুভিয়াস থেকে নেপ্‌ল্‌স্ পর্যন্ত তখন কুয়াশায় ঢাকা থাকে। ক্যাপ্রি যাবার জন্যে পাদ্রী সাহেব আসেন খেয়া-ঘাটে। আন্তোনিও নৌকোর মাঝি। আর দূরের সোরেন্তোর চড়াই থেকে নেমে আসে লারেলা।

শাশ্বতী বলল : জার্মানির লেখক লিখেছেন ইতালির জেলেদের নিয়ে উপন্যাস !

সোফিয়া বলল : হেইস কিন্তু নিজেকে ইতালিয়ান ভাবতেন। আর তেইশ বছর বয়সের লেখা তাঁর এই উপন্যাসটি ইতালিয়ান সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই ক্যাপ্রিতেই শাশ্বতী চিনেছিল সুজিতকে। ছেলেটার মধ্যে প্রচণ্ড লাইফ ছিল। চারিদিকের জগৎকে উপেক্ষা করতে পারত নিষ্ঠুর ভাবে। শাশ্বতীর হাত ধরে বলেছিল : চল তোমাদের বন্ধু জেনের মতো তুমি আমার সঙ্গে চল ব্লু গ্রোত্তো।

এ কথা বাংলায় বলেছিল সুজিত। আর শাশ্বতী বলেছিল : তা হয় না। সোফিয়াকে আমি ফেলে যেতে পারব না।

জেন তোমাদের ফেলে যায় নি ?

কিন্তু আমরা দুজন আছি।

সুজিত বলেছিল : কাল ওরা তিনজন থাকবে।

তারপরে শাশ্বতী বলেছিল তার আপত্তির আসল কারণ। বলেছিল ঃ ইণ্ডিয়ান ছেলেদের সোফিয়া ভাল চোখে দেখে না। তারা নাকি—

বলে থেমে গিয়েছিল শাশ্বতী, আর সুজিত তার অসম্পূর্ণ কথা শোনবার জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে বলেছিল ঃ তারা কী ?

কিন্তু শাশ্বতী সোফিয়ার কথা বলতে পারে নি।

পরদিন সকালে সুজিত এক রকম জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর সোফিয়া হেসেছিল শাশ্বতীর দিকে চেয়ে।

ফিউনিকুলারে চেপে তারা জেলেদের গ্রাম মারিনা গ্রান্দে গিয়েছিল। আর সেখান থেকে নৌকোয় করে ব্লু গ্রোত্তো। এই সুন্দর জায়গাটি দুজনের ভারি ভাল লেগেছিল। শাশ্বতী বলেছিল ঃ কী সুন্দর ভিলাগুলি দেখ ! ফুলে ফুলে ছবির মতো হয়ে আছে।

আর উঁচুনীচু পাহাড় দেখে সুজিত বলেছিল ঃ এসো না। ঐ সুন্দর পথ ধরে ওপরে উঠি !

এই চড়াই আর উৎরাই-এর পথও তাদের খুব ভাল লেগেছিল। আর অ্যানাক্যাপ্রি নামে আর একটি সুন্দর গ্রাম দেখেছিল কাছে। সিজার অগাস্তাস নামে একটা হোটেল দেখে সুজিত বলেছিল ঃ আজ আমরা এইখানে খাব।

সুজিত সেদিন অনেক পয়সা খরচ করেছিল অকারণে ঐ বিরাট হোটেলে। আর শাশ্বতী আশ্চর্য হয়েছিল তার খরচের বহর দেখে। এখন এই কথা মনে হলে সুজিতের এই ছেলেমানুষির জন্যে তার হাসি পায়।

খেয়ে-দেয়ে তারা আবার সমুদ্রের ধারে ফিরে এসেছিল। ছোট ছোট বেলাভূমি এখানে। মারিনা পিক্কোলায় বালির উপরে শুয়েছিল অনেকে। তাই দেখে তারাও শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প করেছিল। দেশের কথা, বিদেশের কথা, বন্ধু-বান্ধবদের কথা, তারপরে নিজেদের কথা।

সুজিত বলেছিল ঃ চল না, কাল নেপ্‌ল্‌সে ফিরে যাই !

শাশ্বতী বলেছিল ঃ আমরা যে আরও দু'তিন দিন থাকব !

ওদের সঙ্গে নাই বা থাকলে !

শাশ্বতী চুপ করে রইল।

আর সুজিত বলল ঃ নেপ্‌ল্‌সে আমরা পম্পাই দেখব। তারপরে যাব রোমে।

তুমি বুঝি রোমে থাক ?

এখন রোমে আছি।

তারপরে বলেছিল ঃ চলো না আমার সঙ্গে। রোমের সব কিছু দেখিয়ে দেব।

শাশ্বতী বলেছিল ঃ রোমে আবার দেখবার কী আছে !

সুজিত আশ্চয হয়ে বলেছিল ঃ দেখবার কিছু নেই !

তারপরেই বলেছিল রোমের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির নাম—বোর্গেস গ্যালারি, কাপিতোলিন মিউজিয়ম, গ্যালারি অফ্ মডার্ন আর্ট, আর ভ্যাটিকান মিউজিয়ম।

শাশ্বতী বলেছিল ঃ এই সব !

সুজিত তাড়াতাড়ি বলেছিল ঃ সব হবে কেন ! হাড্রিয়ান্স্ টুম্ব দেখব। তাইবার নদীর ধারে খানিকক্ষণ হাঁটব, তারপর দেখব সেন্ত্ পিতার্সের কলোসিয়াম ও ফোরাম্স্। আর একদিন থাকলে ঘোড়ায় চড়ে যাব ওল্ড্ আপ্পিয়ান ওয়ে, বাতাকম্বস্ দেখব। আর দেখব মুসোলিনির পানাজো ভেনেজিয়া। কোথায় তোমাকে ডিনার খাওয়াব জানো ? পানাজিতে।

তারপরেই হেসে বলেছিল ঃ এই জায়গার কথা না বলে দিলে তুমি বুঝবে না।

বলে নিজেই তার পরিচয় দিল। এই চমৎকার ভিলাটি ছিল মুসোলিনির মিস্ট্রেস্ ক্লারা পেতাবিয়র ! শহরের মাঝখান থেকে যেখানে যেতে কুড়ি মিনিট সময় লাগে। আর সেখান থেকে রোমের সব কিছু দেখা যায় বলেই তার আকর্ষণ।

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করেছিল : কোথায় রাখবে আমাকে ?

সুজিত একটা মুহূর্ত ভেবে নিয়েই বলেছিল : তার জন্যে ভাবনা নেই। আমার কাছে তো থাকতে দেবে না। কোন ভাল পেনসিওনেয় জায়গা পেয়ে যাবই। পেনসিওনে কথাটা শাশ্বতী বুঝল না। তাই বলল : সে আবার কী ?

সুজিত একটু গর্বের সুরে বলল : ইতালীতে প্রাইভেট লজিং হাউসকে বলে পেনসিওনে। ভাল জায়গা, খরচও কম। অথচ হোটেলের মতো সুবিধেও পাওয়া যায়। তোমার জন্যে আমি হাফ-পেনসিওনের ব্যবস্থা করব। সকালের ব্রেক-ফাস্ট ও একটা মিল। আর একটা মিল আমরা বাইরে খাব।

শাশ্বতী বলল : তোমাকে তো রোমের লোক বলে মনে হচ্ছে !

সুজিত খুশী হয়ে বলল : আমি এমন তাড়াতাড়ি সব কিছু জেনে গেলাম কী করে তাই দেখে ওরাও আশ্চর্য হচ্ছে।

শাশ্বতী বলল : খাওয়াবে কী ?

ভাত খাওয়াব, ভাত। বিসোত্তো। ভাতের সঙ্গে চিকেন মিট ফিশ যা চাও তাই। তার সঙ্গে পেঁয়াজ গোলমরিচ আর অন্য সব মসলা। আর যদি খাঁটি ইতালিয়ান খাবার খেতে চাও তো আন্তিপাস্তোর পরে দেব ভিয়ান আর স্কালোপিন, কিংবা উত্তর ইতালির পোলেস্তা।

শাশ্বতী ঠাট্টা করে বলেছিল, নাম শুনেই নোলা দিয়ে জল পড়ছে।

বলে উঠে পড়েছিল বালির উপর থেকে। তারপরে হেসে বলেছিল : ফিরতে হবে না ?

সুজিত বলেছিল : আগে একটু কফি খেয়ে নিই।

ইতালির সর্বত্র পথে ঘাটে কফির দোকান। এসপ্রেসো কফি। ছোট ছোট পেয়ালায় ইতালিয়ানরা ঘন ঘন কফি খায়। কিন্তু এদের কাছে এসপ্রেসো বেশ কড়া তেতো কফি। তাই শাশ্বতী বলল : না না, কফি খাব না।

দুজনে আবার নৌকোয় গিয়ে উঠেছিল। আর ব্লু গ্রোণ্ডো থেকে ফিরে এসেই সুজিত সোফিয়াকে বলেছিল ঃ আমরা কাল সকালেই নেপ্‌ল্‌স্‌ ফিরছি।

সোফিয়া সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিল ঃ আমরা মানে ?

মানে আমি আর শাশ্বতী।

সত্যি নাকি সোয়াতি ?

বলে সোফিয়া শাশ্বতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তার সেই দুষ্টুমিভরা দৃষ্টি শাশ্বতীর আজও মনে আছে। সেদিন সে হ্যাঁ বলতে লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল ঃ সুজিত কিছুতেই মানছে না।

সোফিয়া বলেছিল ঃ তুমি রাজী হবে, একথা বোঝবার পরে ও মানবে কেন বল! তুমি যে একটু খোশামোদ চাইছ, ও তা বুঝতে পেরেছে।

সোফিয়া এই কথাগুলি শাশ্বতীর কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল। সুজিত যেন শুনতে না পায় এইভাবে। কিন্তু তবু সুজিত শুনতে পেল কিছু। আর বলল ঃ আমি হার মানতে শিখি নি।

বলে দুষ্টু ছেলের মতো হাসতে লাগল।

সোফিয়া বলল ঃ কোথায় নিয়ে যাবে সোয়াতিকে ?

রোমে।

ওমা, রোমে কী দেখবার আছে! বেশ লোক তো তুমি!

সুজিত বলল ঃ তবে কি রিভিয়েরায় যেতে বলছ ?

সোফিয়া বলল ঃ ইতালিতে কি রিভিয়েরা নেই! ইতালির রিভিয়েরাও চমৎকার জায়গা। লোকে তাই আজকাল রিভিয়েরাকে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা বলছে, কেউ যাতে ইতালির রিভিয়েরার সঙ্গে ভুল না করে।

সুজিত বলল ঃ খুব ভাল আইডিয়া! কোথায় সে জায়গা বল তো!

সোফিয়া বলল ঃ সাভোনা থেকে ভেন্তিমিগ্‌লিয়া পর্যন্ত লিওরিয়ান কোস্টের নাম এখন ইতালিয়ান রিভিয়েরা, রিভিয়েরা সেই ফিওরি। ফিওরি মানে জান তো? ফুল—ফ্লাওয়ার্স। কোস্ট্‌ অফ

ফ্লাওয়ার্স। এখানে তোমরা সান রেমোতে যেও। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার মত ফ্যাশনেব্‌ল জায়গা। চমৎকার সব হোটেল, আর একটা ক্যাসিনোও আছে।

তারপরেই বলল: তোমরা তো জুয়া খেলতে ভালবাস না, নাচতেও চাও না দেখি। তোমাদের আর ক্যাসিনোর কী দরকার!

সুজিত বলল: ফুর্তি করতে বেরোলে সব কিছুরই দরকার আছে।

সোফিয়া বলল: তা যদি বল, তাহলে তো আরও সব মজার জায়গা আছে।

সুজিত বলল: তাড়াতাড়ি বলে ফেলো সব কথা।

সোফিয়া বলল: কেবল্ ওয়েতে চেপে যেও মাউন্ট বিগোনোন! মেডিটেরেনিয়ান থেকে সামান্য দূরে। সেখানে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার মতো স্কি করতে পারবে। আর যদি গল্‌ফ্ খেলতে চাও তো পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠেই একটা ভাল গল্‌ফ্ কোর্স পাবে।

শাশ্বতী সকৌতুকে বলল: এ সব তুমি কার সঙ্গে দেখেছ বল তো?

সোফিয়া হেসে বলল: বলব কেন!

সুজিত বলল: এইবারে কাজের কথায় এস। কোন্ পথে সেখানে যাব তাই বল।

সোফিয়া বলল: নেপল্‌স্ থেকে সোজা জেনোয়ায় চলে যেয়ো। ঘণ্টা চারেকের পথ! কলম্বসের জন্মস্থানটা—

কথার মাঝখানেই সোফিয়ার হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে সুজিত বলেছিল: অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।

ব্যস!

বলে সোফিয়া খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

সুজিত তখন শাশ্বতীকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই বেশী ব্যস্ত। তাই জেনোয়া ঘুরে আসার কথা শুনেও জানতে চাইল না এধার থেকেও সেখানে যাবার কোন সরাসরি পথ আছে কিনা।

সুজিত আর কথা বলে সময় নষ্ট করবে না। তাই বলল: আবার দেখা হবে।

সোয়াতিকে যদি আটকে রাখতে না পার তো মাঝে মাঝেই দেখা হবে।

একথার উত্তর না দিয়ে সুজিত শুধু হেসেছিল।

জেনের বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গেও তাদের দেখা হয়েছিল। সে একটা ভালমানুষ গোছের ছেলে। কন্টিনেণ্টের কোথাও বাড়ি। সুজিত এ কথা বুঝেছিল তার ইংরেজী শুনে। ইংরেজের মতো ইংরেজী বলতে পারে না। ভারতীয়ের মতোও না। ইংলণ্ডে গিয়েছিল বলেই হয়তো কিছু শিখেছে। সুজিত তাকেও টা-টা বলে শাশ্বতীকে তাদের দল থেকে টেনে নিয়ে গেল।

সেবারে সুজিতের সঙ্গে কয়েকটা প্রাণবন্ত দিন কাটিয়েছিল শাশ্বতী। নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে রোমে গিয়েছিল। কিন্তু রোম থেকে আর কোথাও যাবার সুযোগ পায় নি। শাশ্বতীর ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল। আর সুজিতও আটকে গিয়েছিল কাজে। বলেছিল: আবার আসবে কথা দিয়ে যাও।

শাশ্বতী বলেছিল: তুমি এসো।

তারপরে দু' একখানা চিঠি এসেছিল সুজিতের। শাশ্বতী উত্তর দিয়েছিল। আবার দেখা হবার আগেই সুজিতকে ফিরে আসতে হয়েছিল দেশে। তারপরে তাকে বোধহয় ভুলেই গিয়েছিল। সুজিত যে বম্বেতে আছে, শাশ্বতী তা জানত না। জানল, যখন সে কলকাতায় বদলি হয়ে এল সম্প্রতি, আর দেখা হয়ে গেল এই টুমরো ক্লাবে।

স্বভাবে এখনও সে আগের মতোই আছে। আগের মতোই সজীব প্রাণবন্ত যুবক। দেহটা একটু ভারি হয়েছে। আর মুখখানা ভারিক্কি। চাপ জুলপি আর গোঁফের জন্যেই বোধহয় এই রকম দেখায়। কিন্তু কথায় ও কাজে সে পরিমাণ গাম্ভীর্য নেই। লোকে

কী ভাবল, তার তোয়াক্কা সে এখনও করে না। সে যা চায় তা পেলেই সে সন্তুষ্ট।

ইতালিতে যে সুজিত বাসু তাকে বলেছিল, আমি হার মানতে শিখি নি, সে আজ কৃষ্ণা মিত্রের মতো একটা সাধারণ মেয়ের কাছে হেরে গেল! কেন হার মানল সুজিত! সে কি বদলে গেছে, না এই হার মানার পেছনে আছে কোন অজ্ঞাত রহস্য!

এই কৃষ্ণা মিত্রের হাবভাব তার কোনদিন পছন্দ হয় না। কেমন একটা অস্বাভাবিক চোখে দেখে তাকে। সন্দেহের চোখে, কিংবা ঈর্ষার চোখে। সুজিতের সঙ্গে তার মাখামাখি যে ভাল চোখে দেখে না, শাশ্বতী তা বোঝে। কিন্তু সে তো তার অভিভাবক নয়, সুজিতেরও নয়।

শাশ্বতীর আজ ঘুম আসছিল না। নানা রকমের আজগুবি কথা তার মনে আসছিল। আজ বড় অশান্ত লাগছে মনটা। শাশ্বতী উঠে পড়ল বিছানা থেকে। বাথরুমে গিয়ে মুখে হাতে জল দিয়ে এল। ঠাণ্ডা জল খেল খানিকটা। তারপরে আবার শুয়ে পড়ল।

এখন সে আর কিছু ভাববে না। কিছু ভাববে না, এই কথাই শুধু ভাববে।

পরদিন সকালে ঘোষাল সাহেব তখনও ব্রেক-ফ্রাস্টের টেবিল ছেড়ে ওঠেন নি। পোটিকোয় চটির শব্দ পেয়ে বললেন: বোধহয় হীরেন এল।

জ্যাঠামশাই!

বলে শাশ্বতী তার চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে উঠে গেল। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল হীরেনবাবুকে।

খাবার ঘরে ঢুকে হীরেনবাবু বললেন: তোমাদের খবর নিতে সকালবেলাতেই চলে এলুম।

শাশ্বতী বলল: বেশ করেছেন।

ঘোষাল সাহেব বললেন: বোসো।

মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন ঃ ওকেও একটু চা দাও।

চা!

বলে হীরেনবাবু কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন ঘোষাল সাহেবের দিকে। আর ঘোষাল সাহেব তখনি বললেন ঃ তবে একটু কফি খাও।

আমি কি ও সব খাই যে তোমরা খাচ্ছ বলে আমার সঙ্গেও ভদ্রতা করতে হবে!

বলে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

শাশ্বতী বলল ঃ তবে আপনি কী খাবেন বলুন?

হীরেনবাবু বললেন ঃ কিছু না। যা খাবার, আমি তা খেয়েই বেরিয়েছি। এর পরে দুপুরে দুটি ভাত খাব। কাল তোমাদের কী স্থির হল, সেই কথা বল। কোন বিদেশী নাটকের অভিনয় করবে, না—

ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ তোমারই জয় হয়েছে।

মানে?

বলে হীরেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

শাশ্বতী বলল ঃ 'মানুষের ক্ষুধা'র অভিনয় হবে স্থির হয়েছে।

তোমাদের ওটাই পছন্দ হল তো!

বলে হীরেনবাবু সগৌরবে তাকালেন ঘোষাল সাহেবের দিকে।

কিন্তু শাশ্বতী এ কথার কোন উত্তর দিল না।

হীরেনবাবু বললেন ঃ আমি জানতাম যে তোমরা এ নাটক নিশ্চয়ই পছন্দ করবে। ছেলেটার লেখার হাত সত্যিই ভাল। একটু উৎসাহ পেলে ভবিষ্যতে নাম করতে পারবে।

শাশ্বতীর ওপরতলায় যাবার জন্যে তাড়া ছিল। বলল ঃ আপনার ছাত্রকে আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের ক্লাবে আসতে বলবেন জ্যাঠামশাই! তাঁকে পেলে আমাদের সুবিধে হত।

তোমাদের ক্লাবে!

হীরেনবাবু একটু থমকে গিয়েছিলেন। তারপরেই বলে উঠলেন ঃ অবশ্য আমি বললে সে নিশ্চয়ই যাবে।

ঘোষাল সাহেব তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন : তুমি একটু থমকে গিয়েছিলে মনে হল।

তাঁর আশঙ্কাটা হীরেনবাবু আর গোপন করলেন না, বললেন : ছেলেটা বড় লাজুক কিনা, মুখ তুলে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

ঘোষাল সাহেব বললেন : তবে সে করে খাবে কী করে?

হীরেনবাবু বললেন : ওর স্বভাবই ওই রকম। অমন মেরিটোরিয়াস ছেলে, ইংরেজী এম-এ-তে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। কিন্তু কথা বলতে বল ইংরেজীতে—

শাশ্বতীর চা খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। হীরেনবাবুর কথায় তার মনোযোগ ছিল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু তা জানবার জন্যে তিনি থামলেন না, বললেন : অদ্ভুত ভাল থিসিস দিয়েছিল শুনেছি। বিষয়টা এমন নতুন যে আমি শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপরে ঘোষাল সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বললেন : তুমিও তো ভাল ইংরেজী শিখেছিলে! চসারের সমসাময়িক আর ক'জন কবির নাম শুনেছিলে বল তো!

ঘোষাল সাহেব একটু গৌরব বোধ করে বললেন : সে সব কি আর মনে আছে!

আরে বাবা নাম শুনে থাকলে তো মনে থাকবে!

ঘোষাল সাহেব ভাবতে লাগলেন, কিন্তু আর একটা নামও তাঁর মনে পড়ল না। তাই দেখে হীরেনবাবু বললেন : আমি দুটো নাম শুনেছি—ল্যাংল্যাণ্ড আর গাওয়ার। হিস্ট্রি অফ লিটারেচারে নাকি এই দুটো নাম আছে। অথচ সাত্যকি সে যুগের আরও অনেকের লেখা নিয়ে আলোচনা করেছে।

ঘোষাল সাহেব বললেন : সে সব নাম সে কোথায় পেল?

সবাই তো তার কাছে এই কথাই জানতে চেয়েছে। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবে, সে নাকি কোন হিস্ট্রির বইএ এ সব নাম পায় নি।

তবে ?

বলে ঘোষাল সাহেব তাঁর বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন।

হীরেনবাবু বললেন: যা শুনেছি, তা বিশ্বাস করতে তোমার কষ্ট হবে। পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটার বাতিক আছে তার। পুরনো সাহেবদের ছেঁড়া বইপত্র সংগ্রহ করেছিল কিছু। তার মধ্যেই খুব পুরনো বই ছিল একখানা। তাতেই সেই সব কবিদের অরিজিনাল কবিতা ছিল। তারপরে বুঝতেই পারছ—

কী ?

পয়সা থাকলে বিলেতে গিয়ে সে এই সব স্টাডি করে আনতে পারত। কিন্তু পয়সার অভাবে লেখালেখি করেই সে তার থিসিসটা কম্‌প্লিট করেছে।

আশ্চর্য !

সগর্বে হীরেনবাবু বললেন: ভাগ্যে এ রকম ছাত্র মেলে ভাই। তাই বলছিলাম—

কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। কথার মাঝখানেই শাশ্বতী উঠে দাঁড়িয়ে বলল: তাহলে তোমরা গল্প কর বাবা, অফিসে যাবার জন্যে আমি তৈরি হয়ে নিই।

তোমার সময় হয়ে গেল নাকি ?

বলে ঘোষাল সাহেব তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে সে তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘোষাল সাহেব এবারে তাঁর বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন: এসো লিভিং-রুমে। ভাল করে বসে গল্প করা যাক।

হীরেনবাবু তাঁর কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। বললেন: চল।

বলে দুই বন্ধুতে এসে বসবার ঘরে বসলেন।

হীরেনবাবু একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। ধারে কাছে কাউকে দেখতে না পেয়েও একটু মৃদুস্বরে বললেন: আজ তোমার

কাছেও একটা কথা জানতে এসেছিলুম। পাছে তর্কের ভেতর ভুলে যাই, তাই এই সময়েই জেনে রাখি।

ঘোষাল সাহেব সহাস্যে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন।

হীরেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন: রাশিয়ান এম্ব্যাসীর কাউকে তুমি চেন?

ঘোষাল সাহেব বেশ আশ্চর্য হলেন এই প্রশ্ন শুনে। কোন উত্তর না দিয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন।

হীরেনবাবু একটা তাড়া দিয়ে বললেন: কাউকে চেন কিনা বল না। তারপরে অমন করে তাকিও।

ঘোষাল সাহেব একটু ভেবে বললেন: সেদিন একটা পার্টিতে ভরোশিলফ নামে এক ছোকরাকে দেখেছিলুম। খুব স্মার্ট ছোকরা। কিন্তু সে কী কাজ করে তা জানি নে।

হীরেনবাবু তাঁর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম বার করে বললেন: দাঁড়াও, নামটা টুকে নিই!

বলে খসখস করে নামটা টুকে নিলেন।

ঘোষাল সাহেব এবারে জিজ্ঞাসা করলেন: কিসের জন্যে দরকার বল তো।

দাঁড়াও না একটুখানি। সব বলছি তোমাকে। এম্ব্যাসীর ঠিকানাটা বল ত এবারে!

ঘোষাল সাহেব বললেন: বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, কিন্তু নম্বরটা বলতে পারব না।

তবে এ কী রকমের ঠিকানা।

শরৎ বোস রোড কোথা থেকে বেরিয়েছে দেখেছ?

দেখেছি।

রিচি রোড কোথা থেকে শুরু হয়েছে, তাও বোধ হয় দেখেছ?

দেখেছি বৈকি।

এই দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তার—

বুঝেছি বুঝেছি, ওর উলটোদিকে তো মিলিটারির ময়দান।

বলে কাগজ আর কলম তাঁর পকেটে পুরলেন, বললেন : এইবারে কী জানতে চাইছ, বল।

ঘোষাল সাহেব বললেন : এই ঠিকানা নিয়ে তুমি কী করবে ?

হীরেনবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন : সময় হলেই বলব।

ঘোষাল সাহেব এবারে রেগে গিয়ে বললেন : যদি কিছু না-ই বলবে তো এতক্ষণ অমন ভণিতা করছিলে কেন ?

কেন, তা বুঝবে না। মানুষ ঘনিষ্ঠ হলেই তোমরা ভাব, তাকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। কার মধ্যে কী আছে, তা আমরা কাছে এসেও জানতে পারি না। অপরে তা আবিষ্কার করে বলে দেবে, এই অপেক্ষায় থাকি।

ঘোষাল সাহেব হেসে বললেন : তুমি কি আমার কথা বলছ, না তোমার নিজের কথা ?

হীরেনবাবু বললেন : তুমি বোকার মত হাসছ কি ! এই তোমার কথাই ধর না। দুদিন পরে তোমাকে যে রমেশ দত্ত হতে দেখব না, তা কি আজ আমি বলতে পারি !

ঘোষাল সাহেব বললেন : হঠাৎ রমেশ দত্তকে টানছ কেন !

তিনি তো তোমার লাইনেরই লোক। ইংরেজ তাকে সি. আই. ই. টাইটেল দিয়েছিল। কিন্তু রিটায়ার করে তিনি ভারতের ইতিহাস পড়ালেন বিলেতের ইউনিভার্সিটিতে। গল্প উপন্যাস তো লিখলেনই, ইংরেজীতে রামায়ণ, মহাভারত লিখলেন, লিখলেন ভারতীয় সভ্যতার কথা। গোটা ঋগ্বেদটাও অনুবাদ করে ফেললেন। অথচ আমরা এই ঋগ্বেদের একটা ঋক্‌ও পড়ি নি। তুমি পড়েছ ?

না।

তবেই দেখ। তাঁর সময়ে যারা একসঙ্গে কাজ করেছিল, তাদের ক'জনে জানত যে রমেশ দত্ত এক দিন সংস্কৃতের বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও চুনকালি মাখাবে !

ঠিক এই সময়েই একখানা গাড়ি এসে পোর্টিকোয় দাঁড়াবার শব্দ পাওয়া গেল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সুজিত বাসু

খুব ব্যস্ত ভাবে ঘরে এসে ঢুকল। আগের মতোই একটু ঝুঁকে ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড করল, আর নমস্কার করল হীরেনবাবুকে। তারপরে ঘরের চারিধারে চেয়ে শাশ্বতীকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়ল।

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ তোমাকে আজ বেশ আপ্‌সেট মনে হচ্ছে!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলে সুজিত হীরেনবাবুর দিকে চেয়ে বলল: আপনার নাটকেরই আমরা অভিনয় করছি, কিন্তু তার ম্যানস্ক্রিপ্টটা—

হীরেনবাবু বলে উঠলেনঃ হাতের লেখা পড়া যাচ্ছে না?

সে যারা টাইপ করবে, তারাই পড়ে নেবে।

তবে?

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অ্যাঁ!

বলে হীরেনবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ অমন ব্যস্ত হচ্ছ কেন! তোমার ঐ ম্যানস্ক্রিপ্ট্ কেউ চুরি করবে না।

হীরেনবাবু কাঁদ-কাঁদ ভাবে বললেনঃ সাত্যকি এই ভয়েই তার পাণ্ডুলিপিটা হাত ছাড়া করত না। এখন দেখছি ঠিকই করত।

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ শাশ্বতী আসুক, তার কাছে আছে কিনা জেনে নাও।

ঠিক এই সময়ে দরজার কাছে লতিফকে দেখতে পেয়ে হীরেনবাবু বলে উঠলেনঃ হ্যাঁ বাবা লতিফ, কাল রাতে তুমি তার হাতে একখানা—

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ ফাইল, ফাইল দেখেছিলে?

লতিফ তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বললঃ ব্যাগ ছাড়া আর কিছু তো হাতে ছিল না।

হীরেনবাবু ধপাস করে বসে পড়লেন। মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর নাক দিয়ে। বললেনঃ ছেলেটার কপালই খারাপ।

সুজিত বললঃ এই রকমের যে একটা ঘটনা ঘটবে, আমি তা জানতাম। এ নিশ্চয়ই কৃষ্ণার কাজ, সে-ই আমাকে ডোবাতে চায়।

কৃষ্ণা কে ?

প্রশ্ন করলেন ঘোষাল সাহেব।

উত্তেজিত ভাবে সুজিত বললঃ কৃষ্ণা মিত্র। এই ক'দিন আগেও আমার বন্ধু ছিল। এখন শত্রু হয়েছে। কাল সবার সামনে অপদস্থ করেছে আমাকে। কিন্তু এ রকমের জঘন্য একটা কাজ করবে, তা আমি বুঝতে পারি নি।

ঘোষাল সাহেবের মধ্যে কোন উদ্বেগ দেখা গেল না। তিনি ধীর স্থির ভাবে বললেনঃ ফাইলটা হয়তো তোমাদের ক্লাবেই পড়ে আছে।

না। ক্লাবের বেয়ারাকে আমি ফোন করে আসছি। সে বলেছে সেখানে কিছু পড়ে নেই।

তাহলে তোমাদের কোন মেম্বার হাতে করে নিয়ে গেছে।

হীরেনবাবু বলে উঠলেনঃ না পাওয়া গেলে কী হবে বল তো ! আমি এক রকম জোর করেই সেটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলুম !

সুজিত বললঃ ভদ্রলোক দিতে চায় না বুঝি ?

অভিনয়ের কথা বললে কী বলত জানি নে। আমি কিছু না বলেই তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলুম।

এই সময়েই শাশ্বতী উপর থেকে নীচে নেমে এল। তাকে দেখতে পেয়েই সুজিত লাফিয়ে উঠল, বললঃ প্লের ফাইলটা কার কাছে আছে তুমি জান ?

শাশ্বতী শান্ত গলায় বললঃ জানি বৈকি।

তুমি জান ! কই, আমাকে বল নি তো !

শাশ্বতী বললঃ তোমাকে বলবার সুযোগ তো দাও নি। কাল তুমি ও ভাবে যখন চলে গেলে, তখন আমাকেই সব সামলাতে হল।

হীরেনবাবু একটা পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: আমি জানতুম, তুমি নিজে হাতে যখন পাণ্ডুলিপিটা নিয়েছ, তখন ও হারাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু সুজিত সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলল: এ সমস্তই কৃষ্ণার কারসাজি। সে চায় না যে আমি তোমাকে পার্টনার নিয়ে নামি। আমার উইক্‌নেস জানে বলেই ও এই কাজ করেছে।

শাশ্বতী বলল: তা তোমার রাগ করবার কী আছে! নাটকটা পড়, নায়কের পার্ট তুমি করতে পারবে কি না ভেবে দেখ। একই কারণে আমিও তো সরে দাঁড়াতে পারি!

হীরেনবাবু বললেন: কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?

শাশ্বতী বলল: না, কোন গোলমাল নয়, সুজিত বলছে নায়কের পার্টে অভিনয় করতে ও পারবে না।

কেন?

বলে হীরেনবাবু সুজিতের মুখের দিকে তাকালেন।

সুজিত বলল: খালি গায়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে অভিনয় করতে হবে। খবরের কাগজে এই ছবি বেরোলে লোকে বলবে কী!

শাশ্বতী হেসে বলল: তুমি নিশ্চিন্ত থাক, খবরের কাগজে আমাদের অভিনয়ের ছবি বেরোবে না।

আলবৎ বেরোবে।

শাশ্বতী বলল: পরশুও তাই বলেছিলে!

সুজিত বলল: তোমাকে বলি নি! প্রেসকে অ্যাপোলোজাইস করতে বাধ্য করেছি।

সত্যি!

বলছে, নিউজ-প্রিণ্টের নাকি ড্রাস্টিক কাট চলছে। কাগজে স্পেসের অভাব। মাত্র ছ' পাতার কাগজ, তার মধ্যে তিনটে পাতা দিতে হয় অ্যাড্‌ভারটিজ্‌মেণ্টের জন্যে। আর সব কিছু বাকি তিন পাতায়—নিউজ, এডিটোরিয়াল, খেলার খবর, সিনেমা থিয়েটার প্রভৃতি যাবতীয় ডেইলি ফীচার।

শাশ্বতী বলল ঃ যাত্রার বিজ্ঞাপনের জন্যে তো গোটা কাগজটাই দিতে পারে !

ঠিক বলেছ। কষে ঝগড়া করেছি তাদের সঙ্গে। শেষে অ্যাপোলোজাইস করে বলেছে যে ওদের উইক্‌লি ফীচারে ইনক্লুড করবে। তার আগেই নাটকের নামটা আমাদের দিতে হবে।

শাশ্বতী বলল ঃ দেখ ঠিক করে !

সুজিত বলল ঃ না ছাপলে পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব। তুমি বেশ গুছিয়ে একটা রাইট-আপ লিখে দিও তো। পড়ে যাতে নিউজ আইটেম বলে মনে হয়।

হীরেনবাবু বললেন ঃ নাটকের লেখক সাত্যকি ভট্টাচার্যের নামটাও দেবে।

নিশ্চয়ই।

বলে দুজনেই বেরিয়ে গেল।

কিন্তু শাশ্বতী তখনই আবার ফিরে এসে বলল ঃ সাত্যকিবাবুকে আজ ক্লাবে পাঠাতে ভুলবেন না জ্যাঠামশাই। সাড়ে পাঁচটা ছ'টার মধ্যেই যেন ভদ্রলোক আসেন।

তোমাদের ঠিকানাটা ?

শাশ্বতী বলতে যাচ্ছিল দেখে হীরেনবাবু বললেন ঃ দাঁড়াও দাঁড়াও, লিখে নিতে হবে।

বলে পকেট থেকে কাগজ কলম বার করতেই শাশ্বতী তা কেড়ে নিয়ে খসখস করে ঠিকানাটা লিখে দিল।

হীরেনবাবু বললেন ঃ বাসের রুটটা বল তো !

শাশ্বতী বলল ঃ বাসের রুট কী হবে! গাড়ি নেই ভদ্রলোকের ?

গাড়ি ! কলেজে মাস্টারী করে কেউ গাড়ি কিনতে পারে ! পয়সার অভাবে যে বিয়ে করতে সাহস পায় না, সে কিনবে গাড়ি ! তুমিও যেমন !

কিন্তু শাশ্বতী তখন বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। একখানা গাড়ির

শব্দ আগেই পাওয়া গিয়েছিল, আর একখানা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পরে। দুখানা গাড়িই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

হীরেনবাবু আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না। বললেন: যাই, সাত্যকিকে তাহলে এখুনি খবরটা দিয়ে আসি।

ঘোষাল সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন: তাহলে তুমি ওদের সঙ্গেই গেলে না কেন? ওরা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যেত!

হীরেনবাবু আশ্চর্য হলেন এই কথা শুনে। বললেন: তাই তো! কিন্তু—

কিন্তু কী?

নিজে থেকে কিছু বলল না তো! ওরা হয়তো পছন্দ করত না। কী দরকার ও সব ঝামেলায়! আর সাত্যকির বাড়ি তো বেশি দূরে নয়, আমি হেঁটেই যাতায়াত করি।

হেঁটে!

কী করব বল! ট্রামে বাসে উঠতে রীতিমতো ভয় করে এখন। এই বয়সে কি বাদুড়-ঝোলা হয়ে যেতে পারি! তার চেয়ে আমার পা দুখানাই ভাল, এ অনেক নির্ভরযোগ্য।

বলে হীরেনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ঘোষাল সাহেবের মনে হল যে এ কালের ছেলেমেয়েরা বুঝি নিজেদের কথাই সারাক্ষণ ভাবে, ভাবে না আর কারও কথা। সাত্যকিকে ক্লাবে পাঠাবার জন্যে যখন তাঁর মেয়ে একজন বৃদ্ধকে হুকুম করে গেল, তখন একবারও ভাবল না তাঁর সমস্যার কথা। হীরেনবাবুর টেলিফোন নেই, সাত্যকিরও বোধহয় নেই। থাকলে হয়তো এখান থেকেই তাকে টেলিফোন করতেন। আকাশের রৌদ্রে এখন উত্তাপ। এই রৌদ্র মাথায় করে এক বৃদ্ধ এখন তাঁর ছাত্রকে সংবাদ দিতে যাবেন! তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলে যে এই বৃদ্ধের কষ্ট কিছু লাঘব হবে, এ কথা তাঁর মেয়ে বুঝল না। অথচ প্রয়োজনটা তাদেরই। তাদের সাহায্য করতে গিয়েই এই বৃদ্ধ যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন।

ঘোষাল সাহেব মুখ বাড়িয়ে দেখলেন যে গেট খুলে হীরেনবাবু হন্তদন্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন ভোরবেলায় বাইরের ঘরে বসে হীরেনবাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কাগজ পড়া তখনও তাঁর শেষ হয় নি। দুর্ভিক্ষের খবর সবই পুরনো। গ্রাম ছেড়ে দলে দলে লোক কলকাতায় আসছে, মরছে ফুটপাথে। নানা সংস্থা থেকে তাদের সাহায্যের জন্যে চাঁদা তোলা হচ্ছে। সরকার নানাভাবে টাকা বিলোচ্ছেন। সে টাকা ঠিক জায়গায় পৌঁছচ্ছে কিনা জানা যাচ্ছে না। টাকা বিতরণের ব্যাপারে নানা জায়গায় গলদ আছে। তার কিছু কিছু ধরা পড়ছে। বেশির ভাগই ধরা পড়ছে না।

হীরেনবাবু এই সব পড়ে খুব বিরক্ত হচ্ছেন। বন্যা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ব্যাপারটা তিনি বোঝেন না। দু' এক বছর পরে পরেই এই রকম ঘটনা ঘটে আসছে। যত দিন থেকে তিনি কাগজ পড়ছেন, তত দিন থেকেই তিনি এই সব দেখে আসছেন। কোন বছর বর্ষা হল না বলে দুর্ভিক্ষ, আবার কোন বছর বেশি বর্ষায় বন্যা, হাহাকার লেগেই আছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দেশে হল না।

হীরেনবাবু বুঝতে পারেন না, কেন এমন হয়। এর কি কোন প্রতিকার নেই! দেশের সর্বত্র ভাল জলসেচের ব্যবস্থা করে কি দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেশটা রক্ষা করা যায় না! না, নদীগুলোয় বাঁধ দিয়ে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যায় না গরিব মানুষগুলোকে! বিদেশের লোক কী করে! সে সব দেশে কি এ সব সমস্যা নেই! কেন নেই!

শৈশবের কথা তাঁর মনে পড়ল। চীনের হোয়াং-হো নদীতে তখন প্রায়ই বন্যা হত। বহু ঘরবাড়ি মানুষ ও পশু বন্যার জলে ভেসে যেত। বড়রা বলত, এই বন্যার জলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভেসে না গেলে চীনের জনসংখ্যা আরও বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিত। কিন্তু এখন

আর তো হোয়াং-হোর বন্যার কথা শোনা যায় না, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের কথাও শোনা যায় না। তারা এখন কী করেছে ?

কিন্তু এ সব নিয়ে কারও মাথা ব্যথা তিনি দেখতে পান না। এই দেশটা যেন মুষ্টিমেয় শহরের লোকের। তাদের সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধা নিয়েই সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে। যারা গ্রাম ছেড়ে আসছে, তাদের গ্রামগুলো কি চুলোয় যাবে! তাদের জন্যে কে ভাববে!

হীরেনবাবু ভাবছিলেন, কাগজটা এবারে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। কিন্তু তার আগেই দরজার বাইরে সাত্যকির গলা শুনতে পেলেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাত্যকি জিজ্ঞাসা করল : ভেতরে আসব স্যর ?

কতকটা অভ্যাসবশেই জিজ্ঞাসা করলেন : কে ?

আমি সাত্যকি।

বলে সে ঘরে ঢুকে পড়ল।

সাত্যকিকে দেখে হীরেনবাবু খুশী হয়ে উঠলেন, কিন্তু বললেন : তা তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিলে কেন ? তোমার জন্যে দরজা কি কোন দিন বন্ধ থাকে ?

না স্যার।

তবে ?

সাত্যকি তাঁকে প্রণাম করবার জন্যে মাথা হেঁট করতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : আবার এই সব করছ! তোমাকে আমি বলি নি যে এ যুগে এ সব কেউ করে না!

সাত্যকি হীরেনবাবুকে চেনে। তাই কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল না।

হীরেনবাবু কিছু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন : এবারে এ সব ছেড়ে দাও সাত্যকি! এখনকার লোক এ সব বোকামি বলে ভাবে।

সাত্যকি সংক্ষেপে বলল : ভাবুক।

হীরেনবাবু হেসে বললেন : তুমি কি আমাকে আশুবাবু ভাব

যে আমার পায়ের ধুলো না নিলে আমি তোমাকে চিনতেই পারব না!

সাত্যকি বোধহয় এ কথাটা বুঝতে পারল না। তাই নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হীরেনবাবু বললেনঃ বুঝতে পারলে না তো! বাংলার বাঘ আশুবাবুর গল্প। আমাদের এক মাস্টারমশাই বলেছিলেন গল্পটা। তিনি একবার প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে নাকি চিনতেই পারেন নি। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে সেবারে ফিরে এসেছিলেন। পরের বারে যখন প্রণাম করলেন, তখন জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁকে।

বলে হাসতে হাসতে ছাত্রকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে নিজেও আবার বসলেন। তারপর হাতের কাগজখানা মুড়ে টেবিলের উপরে রেখে বললেনঃ আমি জানতুম যে তুমি আজ আমার কাছে আসবে।

জানতেন স্যার!

হ্যাঁ, জানতুম বৈকি। তবে ভেবেছিলুম যে হয়তো কলেজের পরে বিকেলের দিকে আসবে।

সাত্যকি আশ্চর্য হয়ে তাকাল হীরেনবাবুর মুখের দিকে।

হীরেনবাবু বললেনঃ আশ্চর্য হচ্ছ তো! দেখ, কী রকম চিনেছি তোমাকে। তোমরা ভাব যে তোমাদের বুড়ো মাস্টার তোমাদের কথা আর ভাবে না।

সাত্যকি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলঃ আপনি কিছু শুনেছেন নাকি স্যার?

শুনেছি বৈকি, সব শুনেছি। তবে গায়ে পড়ে কেউ আমাকে কিছু বলে নি, আমিই জেরা করে সব জেনে নিয়েছি।

সাত্যকি বেশ লজ্জিত ভাবে বললঃ নাটকটা সত্যিই ওদের উপযোগী হয় নি স্যার।

হ্যাঁ!

বলে হীরেনবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

সাত্যকি বলল: নাচ-গান হৈ-হুল্লোড় আছে, এমন নাটক হলেই ওঁদের ভাল হত।

তুমি ওদের কিছু বলেছ নাকি?

সাত্যকি বলল: আমি ওঁদের কোন দোষ দিচ্ছি না স্যার, আমি নিজের নাটকের কথাই বলছি। ওঁদের ওই পরিবেশে আমার নাটকটা খুবই বেমানান হবে।

হীরেনবাবু বললেন: আর কী বলেছ?

সাত্যকি বলল: ওঁরা অনেক খরচপত্র করে অভিনয় করবেন, অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে আসবেন। আর এ রকম একটা—

সাত্যকি থামতেই হীরেনবাবু বললেন: বল বল।

নিরস নাটক। এ নাটক কিছুতেই জমবে না। ওখানে গিয়ে—

কথার মাঝখানেই হীরেনবাবু বললেন: বুঝেছি।

সাত্যকি এবারে আমতা আমতা করে বলল: কথাটা আপনাকে বোধহয় ঠিক বোঝাতে পারলাম না স্যর—

না না, বোঝাতে ঠিকই পেরেছ। তোমার ধারণা হয়েছে যে বেকেটের নোবেল প্রাইজ পাওয়া নাটক পেলেও ওরা তা নষ্ট করে দেবে। এই তো!

সাত্যকি লজ্জিতভাবে বলল: এ আপনি কী বলছেন স্যার! এ রকম কথা আমি একবারও ভাবি নি।

তুমি যা ভেবেছ, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা বল তো! এর আগে এ নাটকের অভিনয় কোথাও করিয়েছিলে?

সাত্যকি বলল: নাটক লেখার কথাই তো আমি কাউকে বলি নি স্যার।

কেন বল নি?

সাত্যকি সত্যি কথাই বলল: এ সব কথা বলতে তো লজ্জা করে!

হুঁ।

বলে হীরেনবাবু ভাবতে লাগলেন।

সাত্যকি এবারে উঠতে যাচ্ছিল। হীরেনবাবু ধমক দিয়ে বললেন: উঠছ কেন? তোমার সঙ্গে আমার আরও কথা আছে।

বলে নিজে উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

সাত্যকি জানে যে হীরেনবাবুর ছাত্র-প্রীতি আগের মতোই আছে। তিনি তাকে কিছু না খেয়ে উঠতে দেবেন না। দুটো রাজভোগ কিংবা দুটো তালশাঁস সন্দেশ তাকে খেতেই হবে। চা খেতে বলবেন না। চা তিনি নিজে খান না, অন্যে খায় তা পছন্দও করেন না।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি ফিরে এলেন। বললেন: তুমি আমাকে কিছু বলতে এসেছিলে?

সাত্যকি বলল: আমার পাণ্ডুলিপিটা ফেরৎ পেলে ভাল হত।

হীরেনবাবু তৎপর ভাবে বললেন: ওটা এখন তোমার ফেরৎ চাওয়া উচিত হবে না।

তারপর একটু থেমে বললেন: আমি তোমার দুঃখটা বুঝতে পারছি সাত্যকি, এর জন্যে আমিই দায়ী।

না স্যর।

না কেন! আমি ঠিকই বলছি। ওরা কেউই তোমার নাটকের খবর রাখত না। এই নাটকে যে তোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আছে সে কথা আমিই জোর দিয়ে বলে এই নাটকটি ধরিয়েছিলুম। তা না হলে ওরা একটা নাচ-গানের নাটকেরই অভিনয় করত।

সেটাই ভাল হত স্যার।

এখন তোমার কথা শুনে তা বুঝতে পারছি! তখন ভেবে-

ছিলুম যে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা নাটকের অভিনয় বেশ সময়োপযোগী হবে।

সাত্যকি বলল: আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন স্যার। আপনার কাছে খবর পেয়ে আমিও এই কথাই ভেবেছিলাম।

ভেবেছিলে তো! থাক, দুঃখ কোরো না। বরং রিহার্সলের সময়ে উপস্থিত থেকে একটু তালিম দিয়ে অভিনয়টা যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা কোরো।

সাত্যকি বলল: ওরা আমাকেও একটা পার্ট দিতে চাইছে।

তোমার উপযোগী কোন পার্ট আছে?

আমার নিজের পার্ট তো আছেই! যে ভূমিকায় আমি সব কিছু দেখেছি, সেই ভূমিকাটি!

ঠিকই তো। তাহলে তোমার আপত্তির তো কোন কারণ নেই!

সাত্যকি বলল: আপনিও তাই বলছেন! কিন্তু কলেজের ছেলেমেয়েরা—

হীরেনবাবু বললেন: আবার সেই পুরনো কথায় ফিরে যাচ্ছ! কি যেন সেই ছেলেটার নাম? সে তো শুনছি ছাত্রীদের সঙ্গে প্রকাশ্যেই প্রেম করছে!

সাত্যকি প্রচুর লজ্জা পেল। কোন উত্তর দিল না।

হীরেনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: শাশ্বতীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে?

সাত্যকি বলল: ক্লাবে তাকে দেখেছি।

কেমন দেখলে বল তো?

সাত্যকি হীরেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল। কেন এই কথা তিনি জানতে চাইছেন। উত্তর দিতে একটু দেরি হচ্ছে দেখে হীরেনবাবু তাড়া দিয়ে বললেন: চুপ করে রইলে কেন?

সাত্যকি বলল: খুবই হালকা স্বভাবের মেয়ে বলে মনে হল। নায়িকার পার্ট ওঁকে দিয়ে হবে না।

হু।

বলে হীরেনবাবু চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন ঃ আর কিছু বলবে ?

সাত্যকি একটু ভেবে বলল ঃ ক্লাবে আর একটি মেয়েকে দেখলাম। দেখতে তেমন ভাল নয়, কিন্তু গম্ভীর স্বভাবের। তাকে নায়িকার পার্ট দিলে মানাত।

তুমি কি এ কথা কাউকে বলেছ ?

না স্যার।

হীরেনবাবু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ মেয়েটির নাম কী কৃষ্ণা ?

হয়তো তাই হবে।

হয়তো বলছ কেন ?

মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি।

হীরেনবাবু বললেন ঃ সুযোগ মতো তার পরিচয়টি জেনে নিও তো! সুজিত বসু নামে যে ছেলেটা আছে, তার সঙ্গে এই মেয়েটির সম্পর্কটাও জেনে নেবার চেষ্টা কোরো।

সাত্যকি কোন উত্তর দেবার আগেই হীরেনবাবুর পুরনো চাকর হারাধন একটা প্লেটে দুটো বড় বড় সন্দেশ নিয়ে এল, আর এক গ্লাস জল। সাত্যকি হাত গুটিয়ে আছে দেখে হীরেনবাবু বললেন ঃ খেয়ে নাও আগে।

সাত্যকি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে প্লেট হাতে নিল। খেতে দেরি করলে হীরেনবাবু ধমক দেবেন বলে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ফেলল। জলের গ্লাসটা নামিয়ে রাখতেই হীরেনবাবু আচমকা প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা সাত্যকি, তুমি বিয়ে করছ না কেন বল তো!

সাত্যকি ভারি লজ্জা পেল। কোন রকমে বলল ঃ কলেজে যা মাইনে পাই স্যার তা দিয়ে—

বাধা দিয়ে হীরেনবাবু বললেন ঃ এ কথা তুমি আমাকে আগেও বলেছ। কিন্তু যারা কম মাইনে পায়, তারা কি সংসার করে না!

সাত্যকি চুপ করে রইল।

হীরেনবাবু বললেন ঃ উত্তর দাও।

সাত্যকি বলল ঃ বিয়ে করে বউকে তো রোজগার করতে বলা যায় না স্যর, আর নিজের আয় কম বলে তাকে সংসারের ঘানি টানতেও বলা যায় না।

তোমার বুড়ো মা আর ক'দিন সংসারের ঘানি টানবেন?

সাত্যকি চুপ করে রইল। মনে মনে ভাবল, আজ মাস্টারমশাই হঠাৎ এ সব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন! অথচ তার কারণও বলছেন না। সাত্যকিরও সাহস হল না কোন প্রশ্ন করার।

হঠাৎ হীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার এখন ফেরার তাড়া নেই তো?

সাত্যকি ভয়ে ভয়ে বলল ঃ আজ প্রথম দুটো পিরিয়ড নেই।

তবে আজ তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাব। তুমি একটু বোসো। আমি তৈরি হয়ে আসছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাত্যকি বসে বসে ভাবতে লাগল মাস্টারমশায়ের কথা। ভদ্রলোককে আজ যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। এ সব ব্যাপার নিয়ে তিনি তো আলোচনা করেন না। আজ এমন নতুন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন!

হীরেনবাবু একটুও সময় নষ্ট করেন নি। গায়ের পাঞ্জাবিটা বদলে লাঠিগাছটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। আর কাঁধের উপরে একখানা চাদর তুলে নিয়েছেন। বেরিয়েই বললেন ঃ এসো।

আর হারাধনকে ডেকে বললেন, বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে।

পথে নেমে সাত্যকি জিজ্ঞাসা করল ঃ কোথায় যেতে হবে স্যর?

হীরেনবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন এই প্রশ্ন শুনে। বললেন ঃ তুমি তো আমার কাছে কখনও কৈফিয়ৎ চাইতে না!

সাত্যকি অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে বলল: কৈফিয়ৎ নয় স্যর, কৌতূহল।

কৌতূহলই বা কেন!

বলে হীরেনবাবু আবার হাঁটতে লাগলেন।

সাত্যকি সত্য কথাই বলল: আজ আমার একটু ভয় করছে স্যর।

হীরেনবাবু বললেন: তোমাকে বাঘের মুখে নিয়ে যাচ্ছি না। ঘোষাল আমাদের পাড়াতেই থাকে। আমার বিশেষ বন্ধু লোক। তার কাছেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

কেন?—এ কথা সাত্যকি জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

হীরেনবাবু বললেন: রিটায়ার করবার আগে সে অ্যাম্বাসাডার হয়েছিল বছর খানেকের জন্য। তার আগে ফরেন সার্ভিসে নানা দেশ ঘুরেছে। কিন্তু লোকটা খারাপ নয়, বুঝলে! ধর্মজ্ঞান আছে। আর এ যুগের চাল চলন তেমন পছন্দ করে না।

সাত্যকি কোন উত্তর দিল না।

হীরেনবাবু বললেন: কিন্তু এখন এমন এক বিপদে পড়েছে যে দু' বেলা আমার পরামর্শ চাইছে। অবশ্য দোষটা ওর নয়। কচি মেয়ে রেখে বউ মারা গেল, আর সেই মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাল বিদেশে রেখে। স্বাধীন ভাবে মানুষ হয়েছে তো মেয়ে, এখন মুশকিলে পড়েছে বাপ। বুঝলে!

সাত্যকি কী বুঝল সেই জানে, বলল: আমার সেখানে না গেলে হয় না স্যর!

হীরেনবাবু আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাত্যকির মুখের দিকে চেয়ে বললেন: কেন বল তো?

সাত্যকি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলল: ও সমাজে আমি ঠিক—

কেন ওরা কি মানুষ নয়?

মানুষের কথা নয় স্যর। ওঁরাই আমাকে বরদাস্ত করতে পারবেন না।

বুঝেছি, তোমার আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে। বেশ আমি একাই যাচ্ছি।

মনে মনে খুশী হলেও সাত্যকি তা প্রকাশ করল না। হীরেনবাবুর পায়ের ধুলো নিল আর একবার। হীরেনবাবু বলে উঠলেন : যেখানে সেখানে কী করছ এ সব!

তারপরেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললেন : তুমি কি সত্যি সত্যিই নাটকের পাণ্ডুলিপিটা ফেরৎ পেতে চাও?

সাত্যকি এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলল : হ্যাঁ স্যর।

তুমি তাহলে মন স্থির করে ফেলেছ?

তার কারণ আছে স্যর।

হীরেনবাবু তাঁর লাঠি মাটির উপরে শক্ত করে চেপে ধরে বললেন : আমাকে বুঝিয়ে বল।

সাত্যকি বলল : আমার মনে হয়, ওরা কেউই আমার নাটকটা আগাগোড়া পড়ে দেখে নি। গোড়ার দিকে বন্যার কথা দেখেই ভেবেছে, এটা তাদের উপযোগী হবে।

এ কথা তো আমিই তাদের বুঝিয়েছি!

কিন্তু আমার বক্তব্য তো ওদেরই সমাজের বিরুদ্ধে স্যার। অভিনয় সার্থক হলে যে ওরা নিজেরাই হাস্যাস্পদ হবে।

হীরেনবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন : তুমি তো সত্য কথাই লিখেছ।

সত্য হলেও ওদের কাছে মারাত্মক।

কিন্তু আর একটা কথা কি ভেবে দেখেছ?

কী কথা স্যর?

তোমার এই নাটক মঞ্চস্থ করার এ রকম সুযোগ আর পাবে না। এ জিনিস আলমারির তাকে তুলে রাখবার জন্যে তো লেখ নি। তোমার এই পরিশ্রমের মূল্য পাওয়াও যে দরকার!

সাত্যকি এ কথার জবাব দিতে পারল না।

হীরেনবাবু বললেন : তুমি এক কাজ কর।

বলুন স্যর।

আজ তুমি সময় মতো ক্লাবে যাও। তাদের বল যে এ নাটকের অভিনয় করতে তোমরা পারবে না। কিন্তু কেন পারবে না, সে কথা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। যদি ওরা নাটকটা ফিরিয়ে দেয় তো নিয়ে চলে এসো। আর যদি জোর দিয়ে বলে যে তারা পারবে, তাহলে তুমিও তাদের সঙ্গে কোমর বেঁধে লেগে যাও। যে ভাবেই হোক, তোমার নাটকের সার্থক অভিনয় হওয়া দরকার।

সাত্যকি চুপ করে রইল।

হীরেনবাবু বললেন: আমার কথা বুঝেছ তো? তুমি নিজে রিহার্সল পরিচালনা কর, দরকার হলে অভিনয় কর।

কিন্তু—

আর কোন কিন্তু নয়। শাশ্বতীকে তোমার পছন্দ না হয় তো তাকে নায়িকার পার্ট দেবার দরকার নেই। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব। তুমি যে মেয়েটির কথা বলছিলে, তাকেই নায়িকার পার্ট দাও।

কিন্তু স্যর—

আবার কিন্তু কিসের! ভয় ডর থাকলে জীবনে কোন বড কাজ করা যায় না সাত্যকি। লজ্জায় চিরদিন মাথা হেঁট করে থাকলে চলবে না!

সাত্যকি এবারে সাহসে ভর করে বলল: ভয়ের কথা নয় স্যর, লজ্জার কথাও নয়। আমি অভিজ্ঞতার অভাবের কথা বলছিলাম। অভিনয় করা বা অভিনয় পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই যে আমার নেই।

কিন্তু তোমার তো সেই জীবনের অভিজ্ঞতা আছে! তোমার মনে যে বেদনা ছিল, তাকে তুমি মঞ্চে তুলে ধরতে পারবে না? কেন পারবে না?

সাত্যকি এতক্ষণ মুখ নীচু করেই কথা বলছিল। এইবারে মুখ তুলে তাকাল। তার দু-চোখের দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় দেখে হীরেনবাবু

বললেন : আমার কথা শোন। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার জয় নিশ্চয়ই হবে।

সাত্যকি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল : আমার লেখাটা বুঝি আপনি পড়েছেন স্যর!

নিশ্চয়ই পড়েছি। কিন্তু বাংলাটা নয়, পড়েছি তোমার ইংরেজী অনুবাদ।

পড়েছেন!

সাত্যকির দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হীরেনবাবু বললেন : শুধু পড়া নয়, অনেক ভেবেছি তোমার বক্তব্য নিয়ে। একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সমাজের খোলসটা তুমি ছাড়িয়ে দিয়েছ। দগ্‌দগে ঘা বেরিয়ে পড়েছে তার গায়ের। চোখের সামনে এই বীভৎস দৃশ্য দেখেও যদি মানুষের চেতনা না হয় তো তাদের মানুষ বলব না।

সাত্যকির দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

হীরেনবাবু হঠাৎ অন্য কথায় চলে গেলেন। বললেন : লেখাটা পড়বার পরে তোমাকে কী একটা বলব ভেবেছিলুম। দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে করে দেখি।

বলে একটুখানি ভেবেই বলে উঠলেন : তোমার ভাষার কথা। তোমার সংলাপ একটু কেমন কেমন লাগছিল।

সাত্যকি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

হীরেনবাবু বললেন : মানে, মাঝে মাঝে ব্যাকরণ—

বলে থামতেই সাত্যকি লজ্জিত ভাবে বলল : ইংরেজী ভাষা এখন অনেক বদলে গেছে স্যর!

হীরেনবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন : বদলে গেছে! বার্ণার্ড শ গল্‌স্‌ওয়ার্দি এদের ভাষা কি আজকাল চলছে না!

ও সব স্যর এখন পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হয়েছে।

হুঁ।

বলে হীরেনবাবু মাথা দোলালেন একটুখানি, বললেন : তা

বদলাবেই তো! বাংলা ভাষাও এখন অনেক বদলে গেছে দেখতে পাই।

সাত্যকি এবারে তার ঘড়ি দেখল। ভাবল, আর বোধহয় দেরি করা উচিত হবে না। ট্রামে বাসে উঠতে হলে অনেকক্ষণ লড়াই করতে হবে।

হীরেনবাবু তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আচ্ছা, তুমি এসো তাহলে।

বলে সাত্যকিকে বিদায় দিয়ে ঘোষাল সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

আজ তাঁর বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। শাশ্বতী বেরিয়ে যাচ্ছিল দেখতে পেয়ে হীরেনবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

শাশ্বতী গ্যারেজের দিকে যাচ্ছিল। হীরেনবাবুকে দেখতে পেয়ে বলল ঃ কাল আপনার ছাত্রকে দেখলাম জ্যাঠামশাই।

হীরেনবাবু সোৎসাহে বললেন ঃ কেমন দেখলে মা ?

শাশ্বতী নাক সিঁটকে বলল ঃ ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছিল ক্লাবে।

তাতে কী হয়েছে ? আমি কী পরে এসেছি ?

শাশ্বতী বলল ঃ আপনার কথা আলাদা। আর আপনি তো ক্লাবে নয়, আমাদের বাড়িতে এসেছেন।

হীরেনবাবু একটু ক্ষুব্ধ ভাবে বললেন ঃ ধুতি পাঞ্জাবি কি ভদ্রলোকের পোশাক নয় !

শাশ্বতী বলল ঃ ক্লাবে সবাই ফর্মাল ড্রেসে যায় কিনা, তাই বলছি।

এমনিতে ছেলেটিকে কেমন দেখলে ? বেশ ইমপ্রেসিভ্ নয় ?

বলে শাশ্বতীর মুখের দিকে তাকালেন।

শাশ্বতী বলল ঃ চোখে পুরু কাচের চশমা পরে সারাক্ষণ মুখ নীচু করে থাকে। স্মার্ট তো নয়ই। ব্রাইট বলেও মনে হল না।

বলে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেল।

হীরেনবাবু বেশ আহত হলেন এই কথা শুনে। মনে হল,

সাত্যকি ঠিকই বলেছে, এ সমাজে তার স্থান নেই, এ সমাজের মানুষ তাকে তার প্রাপ্য কোন দিনই দেবে না। ধীর পদক্ষেপে তিনি পোর্টিকোর দিকে এগিয়ে গেলেন।

সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ পেয়ে ঘোষাল সাহেব বসবার ঘর থেকেই বললেন ঃ আজ এত দেরি হল যে ?

হীরেনবাবু ঘরে ঢুকে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারখানায় বসে বললেন ঃ একটু দেরি হয়ে গেল। তোমাদের খবর সব ভাল তো ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ মেয়ের সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবি নিয়ে কী কথা হচ্ছিল ?

হীরেনবাবু বললেন ঃ সাত্যকি কাল ধুতি পাঞ্জাবি পরে ক্লাবে গিয়ে অপরাধ করেছে।

ঘোষাল সাহেব হেসে বললেন ঃ কিছু দিন আগে হলে তো তাকে ঢুকতেই দিত না। এখনও দেখছি অনেক জায়গায় এ নিয়ম আছে। ব্যাঙ্কোয়েট হলে ডিনার ড্রেস চাই। তবে প্রিন্স কোট নাকি অ্যালাউ করছে।

হীরেনবাবু ক্ষিপ্ত ভাবে বললেন ঃ আর কত কাল তোমরা এ সব আঁকড়ে থাকবে ?

ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ ইংরেজী ভাষাটা ছাড়ছ না কেন? আপত্তি শুধু পোশাকের বেলাতেই !

হীরেনবাবু বললেন ঃ এ সব কথা আগে জানা থাকলে ছেলেটাকে আমি ক্লাবে যেতে বলতুম না।

বলে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ঘোষাল সাহেব বললেন ঃ ওকে কি কেউ অপমান করেছে ?

অপমান করবে কেন ! কিন্তু ও যেমন সেন্টিমেণ্টাল ছেলে, অবজ্ঞা দেখেই অপমানিত বোধ করতে পারে। তোমার কাছে একদিন আনতে পারলে তুমি দেখতে যে এ কালের ছেলে হয়েও কত গভীর ভাবে ভাবতে পারে, কত দরদ দিয়ে অনুভব করতে পারে

অপরের দুঃখ। নিজের ছাত্র বলে আমি বলছি না। এমন ভাল ছেলে আজকাল চোখে পড়ে না। রত্ন। বুঝলে, এক কথায় তাকে রত্নই বলতে হয়।

ঘোষাল সাহেব হেসে বললেনঃ তুমি এখনও সেকেলে আছ। তোমার ঐ রত্নের স্ট্যাণ্ডার্ড কত বদলেছে জান?

না।

বুঝতে পারবে না। কেন না, তোমরা বোঝবার চেস্টাই কর না। একটুখানি চেস্টা করলেই বুঝতে পারতে।

হীরেনবাবু বললেনঃ তা কষ্ট করে একটুখানি বোঝাও না!

ঘোষাল সাহেব বললেনঃ কাল সুজিতের পোশাকটা দেখেছিলে? আর মুখখানা?

দেখেছি।

আমাদের কালে এরকম মুখ আর পোশাক দেখলে লোকে বাঁদর বলত না? কিন্তু আমার মেয়ে শাশ্বতীকে জিজ্ঞেস কর। সে তার ঐ চেহারা খুব স্বাভাবিক ভাবে, আর খুব স্মার্ট। আর তোমার ধুতি পাঞ্জাবি পরা সাত্যকিকেই হয়তো সে অস্বাভাবিক ভেবেছে, আন্‌স্মার্ট বলে অবজ্ঞাও করে থাকতে পারে।

হীরেনবাবু অত্যন্ত বিচলিতভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন। দু' একবার তাঁর দাড়িতেও হাত বুলিয়ে নিলেন।

তাই দেখে ঘোষাল সাহেব একটু হেসে বললেনঃ তুমি যদি তোমার থুতনি আর চোয়ালের দাড়িটুকু চেঁচে ফেলতে পার, আর ধুতির বদলে পরতে পারো একখানা ঝকমকে লুঙ্গি, তো এ বয়সেও আধুনিক বলে তোমার একটা গতি হয়ে যেতে পারে। চেস্টা করে দেখবে?

হীরেনবাবু বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। ঘোষাল সাহেবের রসিকতাটা বোধহয় শুনতেই পান নি। বললেনঃ তুমি ঠিকই বলেছ। এই সমাজটাই বদলে গেছে। আর আমরা আমাদের পুরনো ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে বসে আছি।

বলতে বলতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

শাশ্বতীর আজ কাজে মন লাগছিল না। বারে বারেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। বারে বারেই মনে পড়ছিল তার অভিনয়ের কথা। এ রকমের একটা বিশ্রী পার্টে সে ঠিক মতো অভিনয় করতে পারবে কি না। তার নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে। ঐ রকম জঘন্য পরিবেশের কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই। যা কখনও দেখে নি, তা কি স্টেজে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব! অথচ সুজিতও শেষ পর্যন্ত এই নাটকটাই পছন্দ করল! আশ্চর্য তার রুচির পরিবর্তন!

এই সময়েই সুজিত তাকে টেলিফোন করল। জিজ্ঞাসা করল: কাল তুমি সাত্যকি ভট্টাচার্যকে দেখেছিলে? আমাদের নাটকের লেখককে?

শাশ্বতী উত্তর দিল: দেখেছি।

কিছু বলেছিল তোমাকে?

না।

কাল রাতে আমাকে কী বলেছিল, তা বোধহয় তোমাকে বলি নি!

না।

সুজিত বলল: সব কিছু মিটে যাবার পর আমার কাছে এসে চুপিচুপি বলেছিল কথাটা।

কী কথা?

আমার নাটকটা ফিরিয়ে দিন।

শাশ্বতী আশ্চর্য হয়ে বলল: কেন?

আমিও ঠিক এই কথাই তাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, এ নাটক এখানে মানাবে না।

শাশ্বতী বলল: মানাবে না! কী জবাব দিলে তুমি?

বললাম: পাগলামি করবেন না। প্রেসে জানিয়ে দিয়েছি, এখন আর পেছোতে পারব না!

কী বললেন ভদ্রলোক ?

মুখচোরা লোক তো, এর পরে আর কিছু বলতে পারল না।

বিকেলের দিকে সুজিত আবার টেলিফোন করল শাশ্বতীকে ঃ বলল ঃ একটু আগে সাত্যকি টেলিফোন করেছিল।

কী বলল ?

সেই এক কথা। নাটকটা তাকে ফেরত দিতে হবে।

কেন ?

এ নাটক নাকি আমাদের ক্লাবের একেবারে উপযোগী হবে না।

শাশ্বতী বলল ঃ তুমি কী জবাব দিলে ?

বললাম, কাল রাতেই তো আপনাকে বলেছি যে এখন আর তা সম্ভব নয়।

কিন্তু—

কিন্তু আবার কী !

শাশ্বতী বলল ঃ অত খোশামোদের কী দরকার ! দাও না ফিরিয়ে নাটকটা ! আমরাও বেঁচে যাই।

সুজিত বলল ঃ সেকি কথা ! 'মানুষের ক্ষুধা' নামটারই যে একটা অ্যাপিল আছে, তা বুঝতে পারছ না। প্রেস খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এই নাম। আমার বিশ্বাস, পাবলিকও করবে।

কিন্তু লোকটা যে খুব জেদী মনে হচ্ছে ! তুমি কি ফাইনাল জবাব দিয়ে দিয়েছ ?

সুজিত বলল ঃ না, লোকটাকে চটাতে চাইলাম না।

কী বললে ?

বললাম, সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে আসুন। তখন ভালো করে কথা হবে।

তোমার কথা মেনে নিয়েছে তো ?

সুজিত বলল ঃ মনে হচ্ছে ক্লাবে আসবে। তুমি একটা কাজ কোরো—একটু আপ্ করে দিও লোকটাকে, বুঝলে !

সাড়ে চারটের পরে সুজিত আবার টেলিফোন করল

শাশ্বতীকে। বলল: তোমার আজ অফিস থেকে বেরোতে দেরি হবে না তো?

শাশ্বতী বলল: আমার বস্ আজ নেই, তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই সব দেখতে হবে।

তার মানে?

এখনও কিছু বলতে পারছি না।

সেকি!

শাশ্বতী বলল: নতুন ক্লায়েন্ট্ এসে গেলে আমাকেই অ্যাটেণ্ড্ করতে হবে।

তাহলে কি পাঁচটায় আমি আর একবার টেলিফোন করব তোমাকে? না, তুমিই আমাকে বলবে?

তার দরকার কী! এখান থেকেই আমি ক্লাবে চলে যাব।

সুজিত বলল: একসঙ্গে বেরোতে পারলে একটা পছন্দমতো জায়গায় চা খাওয়া যেত।

কেন, ক্লাবের চা তোমার পছন্দ হয় না?

সেখানে পাঁচজনের সামনে--

অন্যখানেও তো পাঁচজন থাকবে!

তারা তো পরিচিত নয়, তাই আমাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

শাশ্বতী বলল: বুঝেছি।

সুজিত বলল: তাহলে সেই কথাই রইল। তোমার কাজ শেষ হলেই আমাকে একটা টেলিফোন কোরো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি এসে পড়ব। চার মিনিট তিরিশ সেকেণ্ডে তুমি লিফটের সামনে এস। আর নীচে নেমে বাইরে এলেই আমাকে দেখতে পাবে।

শাশ্বতী বলল: আচ্ছা।

রিসিভার নামিয়ে রেখে শাশ্বতী হাসল। সুজিত বাসু এই রকমই ছিল। এখন তো সে অনেক অন্তরঙ্গ হয়েছে। কিন্তু

একদিন সামান্য পরিচয় মূলধন করেই সে তার উপরে অনেক জোর খাটিয়েছিল।

এর পরে শাশ্বতী নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। পাঁচটা কখন বেজে গিয়েছিল তা বুঝতেই পারে নি। চমকে উঠল টেলিফোনের শব্দে। সুজিত জিজ্ঞাসা করল : তুমি কি আটকে পড়েছ নাকি?

শাশ্বতী ঠিক প্রস্তুত ছিল না উত্তরের জন্যে, সত্যি কথাই বলে ফেলল : না।

তবে আমাকে রিং করলে না কেন?

শাশ্বতী সামলে নিয়ে বলল : একটু ওয়েট করে দেখছিলাম। তুমি বেরিয়ে পড়।

বলে নিজের ঘড়িটা দেখল। সেকেণ্ডের হিসেব করতে সে পারবে না। পুরো পাঁচ মিনিট পরেই নীচে নামবে। কিন্তু না, একটু দেরি হলেই হয়তো সুজিত নিজেই উপরে উঠে আসবে। রোজ রোজ তার অফিসে কেউ আসে শাশ্বতী তা চায় না। এটা অফিস। এখানে একটা অন্য রকমের ডিগ্‌নিটি আছে। এটা সে নষ্ট হতে দিতে চায় না। সুজিত যে তার এই মনোভাব বুঝেছে, তা সে বুঝতে পারছে। তাই এই সব সেকেণ্ডের হিসেব। সব কাজেই তার ধৈর্য কম। অপেক্ষা করতে সে যেন শেখে নি। নিজের অফিসের কাজ সে কী ভাবে করে, শাশ্বতী মাঝে মাঝে সেই কথা ভাবে।

শাশ্বতী নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখল। খোলা ড্রয়ারে চাবি দিয়ে চাবিটা নিজের ভ্যানিটি ব্যাগে পুরল। তারপর টয়লেটে গিয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে নিল। অফিসের কাপড়ে ক্লাবে যেতে একটু সঙ্কোচ হয়। কিন্তু বাড়ি ফেরার উপায় নেই। আবার ক্লাবের কাপড়ে অফিসে আসতেও লজ্জা করে। বিশেষ করে প্রসাধন করে আসা তো একেবারেই অসম্ভব।

সুজিত এ সব কথা বুঝতেই চায় না। বলে, কোন পার্টি থাকলে এ সব কথা ভেবো। সাজপোশাক রোজকার জন্যে নয়। আমরা ওয়ার্কিং ক্লাবের লোক, আমাদের অত সাজসজ্জা মানায় না।

কিন্তু শাশ্বতী দেখেছে যে সুজিত এসব ব্যাপারে খুব সচেতন নয়। হাতের কাছে যা পাচ্ছে, তাই পরে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তার হাতের কাছে সাদাসিধে পোশাক থাকে না বলেই মুশকিল। সব সময় সে সেজে আছে দেখায়।

শাশ্বতী তার হাতের ঘড়িটা দেখল। আরও মিনিট দুই সময় আছে। আগে ভাগে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকাও বড় অশোভন মনে হয়। দরওয়ান দেখতে পায়। অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ভাবতে বেশ লজ্জা করে। সুজিত এ জিনিসটা ঠিক বোঝে না। নিজেকে এই ভাবে অপেক্ষা করতে হয় না বলেই বোঝে না। তাই নিজে একটু আগে পৌঁছলেই লাফিয়ে উঠে আসে।

শাশ্বতী ভাবল যে এর চেয়ে কোন রেস্তোরাঁয় মীট করাই ভাল। সময়ের হিসেব তাহলে সেকেণ্ডের কাঁটা ধরে করতে হবে না। যে পরে আসবে সে রেস্তোরাঁর ভিতরে ঢুকে খুঁজে বার করবে সঙ্গীকে। সুজিতকে আজ সে এই পরামর্শই দেবে।

টেলিফোনের ব্যাপারে শাশ্বতী মনে মনে তার বস্‌কে ধন্যবাদ দেয়। বস্ তার টেবলে একটা ডাইরেক্ট্ টেলিফোনের কানেকশন দিয়েছেন। কী ভেবে সেটা দিয়েছেন তা তিনি নিজেই জানেন। কিন্তু নিজে তা ব্যবহার করেন না। তিনি ইন্টার-কমে কথা বলেন। আর তাঁর সহকর্মীরা অফিসের এক্স্‌চেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত। বাইরে কারও সঙ্গে কথা বলতে হলে এক্স্‌চেঞ্জকে বলতে হয়। ইচ্ছে করলে এক্স্‌চেঞ্জের মেয়েরা সব কথাই শুনতে পারে। শাশ্বতীর এই ডাইরেক্ট্ টেলিফোনটি না থাকলে সুজিতের জন্যে লজ্জায় তার মাথা কাটা যেত। এক্স্‌চেঞ্জের মেয়েরা কী ভাবত তাকে!

শাশ্বতী এইবারে দেখল যে পাঁচ মিনিট হতে চলেছে, সেকেণ্ডের কাঁটাটা দেখে রাখে নি বলে সেকেণ্ডের হিসেব সে করে নি। টেবলের ওপর থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। অর্ডার্লি উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম করেছিল; কিন্তু শাশ্বতী ব্যস্ত ভাবে লিফ্‌টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

লিফ্‌ট্ নীচে। শাশ্বতী বেল টিপবার আগেই দেখল যে ইন্-ইউজের আলো জ্বলে উঠল। লিফ্‌টেই কেউ উপরে উঠছে। কিন্তু অফিসের ছুটির পরে উপরে উঠবে কে! কেউ তো লিফ্‌ট্ ডাকে নি! না, উপরে দরকার হবে ভেবে লিফ্‌ট-ম্যান নিজেই উঠে আসছে! কিন্তু কোন্ তলায় সে উঠবে!

বেশীক্ষণ শাশ্বতীকে ভাবতে হল না। লিফ্‌ট তার সামনে এসেই থামল। লিফ্‌ট ম্যান দরজা খুলতে সে সুজিতকে দেখল ভিতরে। আর কেউ নেই। তাই তাকে বেরোতে না দিয়ে শাশ্বতী ভিতরে ঢুকে পড়ল। আর সুজিত বলল: নীচে।

লিফ্‌ট ম্যান দরজা বন্ধ করে তাদের নীচে পৌঁছে দিল। লিফ্‌টের ভিতরে শাশ্বতী কোন কথা বলল না। বাইরে বেরিয়ে নিজেদের গাড়ির দিকে যেতে যেতে শাশ্বতী একটু নরম সুরে ধমক দিয়ে বলল: ভীষণ ইম্‌পেশেণ্ট তুমি!

সুজিত হেসে বলল: টাইম ইজ মানি।

শাশ্বতী বলল: কিন্তু একথা তো সব সময় তোমার মনে থাকে না!

যখন দরকার থাকে, তখন ঠিক মনে রাখি।

বলে সুজিত হাসল। তারপরে চলতে চলতে বলল: তুমি রোজ নিজের গাড়ি নিয়ে কেন আস বুঝতে পারি নে। তোমার অফিসের গাড়িতেই তো আসতে পার।

তাহলে তোমার ভারি সুবিধে হয়, এই তো!

তোমারও অসুবিধে হবে না। খরচ বাঁচবে। পেট্রোলের যা দাম হয়েছে—

শাশ্বতী বলল : বেশ তো, এর পরে পায়ে হেঁটে চলব, চারি দিকের লোকজন দেখতে দেখতে। আর তোমার সঙ্গে এমনি করে—

কথাটা শেষ করবার অগেই সে নিজের গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে গাড়ির চাবি বার করে দরজা খুলে বলল : কোথায় যেতে হবে ?

পথে যেতে যেতেই তুমি ঠিক করে নিও। আমি তোমাকে ফলো করব।

বেশ।

বলে শাশ্বতী তার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

আর সুজিত এগিয়ে গেল তার নিজের গাড়ির দিকে।

সাত্যকি আজ একটু তাড়াতাড়ি ক্লাবে এসেছিল। ভেবেছিল, সবাই একত্র হবার আগেই সে সুজিতের সঙ্গে নিরিবিলিতে কাজটা সেরে নেবে। মানে, নানা রকমের যুক্তি দিয়ে বোঝাবে যে তার নাটকে এমন কোন আবেদন নেই যা দর্শক আকর্ষণ করবে। আর ঐ নাটকে সে রকম কোন দৃশ্যের অবতারণাও সম্ভব নয়। সাত্যকির বিশ্বাস হয়েছে যে ভাল করে বুঝিয়ে বললে সুজিত এই কথা বুঝবে। বিশেষ করে নাচ-গানের অভাবে যে নাটক সফল হয় না, এ কথা সবাই আজকাল বোঝে।

মনে মনে সাত্যকি তার এই আপত্তির কারণটা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেছিল। তাতে বারে বারেই তার শাশ্বতীর কথা মনে এসেছে। শাশ্বতী দেখতে ভাল হতে পারে, নায়িকার পার্টে মানাবেও ভাল, কিন্তু অভিনয় ঠিক করতে পারবে না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ সে নিশ্চয়ই এখনও দেখে নি, তাদের সুখ-দুঃখের কোন অভিজ্ঞতাও তার নেই। নিজে দুঃখ না পেয়ে থাকলে অভিনয়ে কি সেই দুঃখ ফুটিয়ে তোলা যায় ! অসম্ভব।

সাত্যকি জানতে পেরেছে, শাশ্বতী যে সমাজ থেকে এসেছে,

তা সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ। তার চিরদিনের ধারণা যে এই সমাজের মানুষদের জন্যেই পৃথিবীতে এত দুঃখ। নিজেদের বিলাস-ব্যসনের জন্যে তারা কৃত্রিম দুঃখের সৃষ্টি করে, আর সেই দুঃখ মোচনের নামে অভিনয় করে। সে আরও জঘন্য। আরও নিন্দার কাজ। মানুষের দুঃখ এরা কতটুকু বোঝে! এরা যদি সেই দুঃখ ফুটিয়ে তোলার অভিনয় করে তাহলে বিদ্রূপ করছে বলে মনে হবে। সাত্যকি তো তাদের বিদ্রূপ করতে চায় নি! সে চেয়েছে তাদের গভীর বেদনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবার সামনে তুলে ধরতে। ধনীর ক্ষুধার জন্যেই দারিদ্রের ক্ষুধা কোন দিন দূর হবে না। এই কথাই সাত্যকি বলতে চেয়েছে তার মানুষের ক্ষুধায়। সাত্যকি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এই সত্যকে। তাই এ কথাও বিশ্বাস করে যে সুজিত ও শাশ্বতীর টু-মরো ক্লাবের সদস্যরা এই সত্যকে রূপ দিতে গিয়ে তাকে একটা বিদ্রূপে পরিণত করবে। সাত্যকি তা চায় না, সাত্যকি তাই আজ শেষ চেষ্টা করবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে একা অপেক্ষা করতে হল না। কৃষ্ণা মিত্র নামের সেই মেয়েটি এসে পড়ল। সাত্যকিকে দেখে খুশী হয়ে নমস্কার করল, বলল: আপনি এসে গেছেন! ভালই হল। আমাকে আর একা বসে থাকতে হবে না।

সাত্যকি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল ঠিকই। কিন্তু বিপদে পড়ল। বুঝতে পারল যে মেয়েটির পরিচয় জানার অসুবিধা হয়ে গেল। মেয়েটি তাকে না চিনলে নিজের পরিচয় দিতে পারত, আদান-প্রদান হত পরিচয়ের। কিন্তু তার উপায় রইল না দেখে বলল: আপনি এসে পড়ায় ভালই হল।

কেন বলুন তো?

সাত্যকি বুঝতে পারল যে পরিচয় জেনে নেবার এই একটা সুযোগ। বলল: কাল সবাইকে এমন ব্যস্ত দেখলাম যে কারও সঙ্গে আমার পরিচয় হল না।

আমার সঙ্গেও পরিচয় হয় নি বুঝি!

বলে হেসে ফেলল মেয়েটি। তার পরে বলল: আমার নাম কৃষ্ণা মিত্র। গায়ের রঙ দেখে মা আমার এই নাম রেখেছিলেন।

বেশ মিষ্টি মুখে হাসতে লাগল।

সাত্যকি দেখল যে তার রঙ এমন কিছু কালো নয় যে কৃষ্ণা নামটি সার্থক হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। বরং সে নিজের হাত দু'খানাই একবার দেখে নিল।

কৃষ্ণা হেসে বলল: ওকি, নিজের দিকে চাইছেন কেন?

সাত্যকির মুখে চট করে এর উত্তর এসে গেল, বলল: দেখছি, আমার নাম তাহলে নিগ্রো ভট্টাচায রাখা উচিত হত কি না!

কৃষ্ণা এবারে হাসিতে উচ্চকিত হয়ে উঠল।

সেই মুহূর্তে সাত্যকির মনে হল যে মেয়েটিকে সে যেমন গম্ভীর ভেবেছিল, সে তেমন নয়। এই গাম্ভীর্য তার বাইরের, ভিতরে একটি স্নিগ্ধ কোমল হৃদয় আছে।

তারপরে তাদের 'মানুষের ক্ষুধা' নিয়ে দু'একটা কথা হল। সাত্যকি বলল: দেখুন তো, কী বিপদে পড়েছি!

কৃষ্ণা হেসে বলল: বিপদ কিসের!

বিপদ নয়? কোনদিন কি এ সব কাজ করেছি!

এখানে আর প্রফেশনাল কে আছে বলুন! সবাই তো অ্যামেচার! শখ করে! শখ করে এই অভিনয়।

সাত্যকি আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল।

কৃষ্ণা বলল: তা ছাড়া আর কী! কেউ কি সীরিয়াস বলে ভাবছেন? কেউ না। সবই হুজুগ, একটা ছুতো নিয়ে মাতামাতি। কাগজে নাম বেরোবে আর—

বলে কৃষ্ণা থেমে গেল।

সাত্যকি একটু অপেক্ষা করে বলল: আর কী?

কৃষ্ণা একটু লজ্জিত ভাবে বলল: থাক, ব্যক্তিগত কথা। আমাদের কাছে সুজিত যতটুকু চাইছে ততটুকুই আমরা দেব।

সাত্যকির কাছে এ কথা একটু হেঁয়ালির মতো মনে হল। কিন্তু এর পরে সে কী বলবে ভেবে পেল না।

কৃষ্ণাই আবার কথা কইল: আপনি শুনলাম নাটকটা ফেরত চেয়েছেন?

আপনি শুনেছেন!

কাল রাতে ফেরার সময়ে একটা কানাঘুষা শুনেছি। আপনি নাকি আড়ালে সুজিতকে এই কথা বলেছেন!

সাত্যকি বলল: ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু মিস্টার বাসু রাজী হন নি!

কৃষ্ণা বলল: আপনার আপত্তির কারণ আমি অনুমান করতে পারি।

পারেন?

বলে সাত্যকি কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল কৌতূহল নিয়ে।

কৃষ্ণা বলল: এরা আয় করবে যত, তার চেয়ে ব্যয় করবে বেশী।

তার পরেই প্রশ্ন করল: সে দিনের ফাংশনে কত খরচ হয়েছে জানেন?

সাত্যকি বলল: আমি ঠিক এ কারণে আপত্তি করি নি।

তবে?

আমার মনে হচ্ছে যে এই নাটকের অভিনয় ঠিক মতো হবে না।

কেন?

মিস ঘোষাল নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

পরম বিস্ময়ে কৃষ্ণা বলল: আপনি বলছেন কী!

কিন্তু সাত্যকি খুব শান্ত কণ্ঠে বলল: আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

সাত্যকির মুখের দিকে তাকাল কৃষ্ণা।

সাত্যকি বলল: নায়িকার ভূমিকায় আপনি নামবেন? যদি রাজী হন তো মিস্টার বাসুকে আমি অনুরোধ করতে পারি।

এক মুহূর্তে কৃষ্ণা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল: তা হয় না।

কেন হয় না?

কিছুদিন আগে হলে তা সম্ভব হত। সুজিত নিজেই আমাকে অনুরোধ করত।

সাত্যকি বলল: এখন আপত্তি হবে কেন?

সেকথা তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

বলে কৃষ্ণা তার মুখ ফিরিয়ে নিল।

কৃষ্ণার বেদনার্ত মুখখানা সাত্যকি দেখতে পেয়েছিল। তার মনে হল যে না জেনে সে এই মেয়েটির কোন ক্ষত স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। এই অপরাধের জন্য তার দুঃখ হল, কিন্তু কী বলা উচিত তা ভেবে পেল না।

ঠিক এই সময়ে আরও দু'তিনজন এসে পড়ায় সাত্যকি যেন বেঁচে গেল। কৃষ্ণা এদের সবারই পরিচিত। তাকে দেখতে পেয়ে তারা কলরব করে উঠল। একটি মেয়ে প্রশ্ন করল: সুজিত কোথায়?

কৃষ্ণা সংক্ষেপে বলল: জানি নে।

আর কত দিন মান করে থাকবে ভাই? শেষে হাত ছাড়া না হয়ে যায়!

কৃষ্ণা এ কথার উত্তর দিল না। সে আবার আগের মতো গম্ভীর হয়ে গেল।

একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সাত্যকি। এদের কারও সঙ্গে তার পরিচয় নেই। কৃষ্ণা পরিচয় করিয়ে দিল না কারও সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত নিজেই এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল।

সেই মেয়েটি বলল: ও, আপনিই সাত্যকি ভট্টাচার্য! তা ক্লাবে আপনার নাম তো আগে কখনও শুনি নি!

সাত্যকি বলল: তা শুনবেন কী করে! আমি তো ক্লাবের

মেম্বার নই, আর কোন কেষ্ট-বিষ্টু মানুষও নই, বলে হাসতে লাগল। ভারী সরল এই হাসি।

মেয়েটি বলল: আপনি নাটক লেখেন শুনেছি!

লিখি বলবেন না, একটাই লিখেছি। আর সে পরিচয় যাতে গোপন থাকে, তারই চেষ্টা এখন করছি।

কেন?

এ কথার উত্তর দিল কৃষ্ণা, বলল: নায়িকা ওঁর পছন্দ হয় নি।

পছন্দ হয় নি! কী সর্বনাশ! অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট শাশ্বতী ঘোষালকে আপনার পছন্দ হল না! বলবেন না এ কথা। সুজিত বাসু শুনলে—

কথাটা সে শেষ করতে পারল না। ঠিক এই সময়েই সুজিত আর শাশ্বতীকে দেখা গেল পাশাপাশি আসতে।

সাত্যকি শক্ত হয়ে বসল। হীরেনবাবুর কথা তার মনে পড়ে গেছে। আজ তাকে এ যুগের লোকের মতো কথা বলতে হবে। ভালোমানুষ হয়ে সর্বত্র মার খেলে তার চলবে না। সাত্যকি আজ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এসেছে। সে আর কখনও কারও কাছে হারবে না। এখন থেকে সর্বত্র সে জিতবার চেষ্টা করবে। আর তার প্রথম চেষ্টা হবে এইখানেই, এই টু-মরো ক্লাবে। একটা সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত পরিবেশে সে প্রথম পরীক্ষা দেবে বলে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠল।

সাত্যকির দিকে শাশ্বতী তাকাল না। সুজিত তাকে এক নজরে দেখে বলল: আপনি এসেছেন!

সাত্যকি এ কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। বলল: আপনার ফুরসত হলে একটু আড়ালে আসবেন।

সুজিত উত্তরে বলল: আড়ালের দরকার কী! উই আর অল ফ্রেণ্ড্স্ হিয়ার!

কৃষ্ণা নয়, অন্য মেয়েটি এগিয়ে এল সামনে, বলল: কথাটা উনি সবার সামনে বলতে চান না। মনে হয়, নায়িকা ওঁর পছন্দ হয় নি।

হোয়াট্‌ !

বলে সুজিত যেন ফেটে পড়ল।

সাত্যকি নাটক ফেরত চাইবার কথা ভুলে গিয়ে বলল : নাটকটি শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কেন আমি এ কথা বলছি।

শাশ্বতী ফিরে দাঁড়িয়েছিল। তার কানের দু'পাশে রক্ত যেন ফেটে বার হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল যে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে।

কিন্তু সাত্যকি থামে নি, বলল : অভিনয় একটা আর্ট। এর জন্যে সাধনার দরকার। কোন চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে হলে নিজেকে সেই চরিত্রের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে হয়। আমার মনে হয় যে এই নাটকটির অভিনয় না করে আপনারা একটি ব্যালের আয়োজন করুন। সেটা এখানে সার্থক হবে।

কৃষ্ণা আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সাত্যকির দিকে। একটু আগে এই লোকটিকে তার মুখচোরা মানুষ বলে মনে হয়েছিল। অথচ এখন এই মুহূর্তে সে তার বক্তব্যকে এমন ভাষায় জানিয়ে দিতে পারল !

সহসা সুজিত কোন উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু শাশ্বতী সুজিতকে বলল : আমার কপিটা কোথায়।

সুজিত বলল : সবটা তো টাইপ হয়ে ওঠে নি। যতটুকু হয়েছে তা আমার কাছে আছে।

দেখি।

বলে শাশ্বতী তার হাত বাড়াল।

সুজিত ব্রীফ কেসটা খুলে একগোছা কাগজ বার করে তার হাতে দিল।

কাগজগুলোর উপর একটা নজর বুলিয়ে শাশ্বতী বলে উঠল এ কী ছাপা হয়েছে !

সুজিত বলল : বাংলা টাইপই এই রকম।

শাশ্বতী বলল ঃ হাতে লিখিয়ে নিলে না কেন ?

যদি বল তাই করতে হবে।

শাশ্বতী দৃঢ় স্বরে বলল ঃ আজ তোমার পুরো ম্যানুস্ক্রিপট্ আমাকে দিতে হবে।

সুজিত খানিকটা আশ্চর্য হয়ে বলল ঃ তাই দেব।

শাশ্বতী বলল ঃ এখন দিতে না পার। পরে পৌঁছে দিও। আজ রাতেই আমি সবটা পড়ে দেখতে চাই।

তারপরে সাত্যকির দিকে ফিরে বলল ঃ আজ রিহার্শল হবে না সাত্যকিবাবু, আপনি কাল আসবেন। কাল আপনার সঙ্গে কথা হবে।

বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না শাশ্বতী, বেরিয়ে গেল টু-মরো ক্লাবের রিহার্শলের ঘর থেকে। তাকে আটকে রাখার সাহস কারও হল না।

সুজিত রেগে গেল সাত্যকির উপরেই। বলল ঃ আপনি কী রকম লোক মশাই। একখানা নাটক লিখে কি সবার মাথা কিনে ফেলেছেন !

সাত্যকি বোধহয় লজ্জা পেয়েছিল। ক্ষমা চাইবে কি না ভেবে স্থির করার আগেই কৃষ্ণা বলল ঃ ওঁর দোষ কী ! উনি কোন অপমানের কথা বলেন নি।

সুজিত বলল ঃ গলা ধাক্কা দিলেই কি অপমান হয় !

কৃষ্ণা কঠিন ভাবে বলল ঃ তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না সুজিত।

তাড়াতাড়ি সাত্যকি বলল ঃ আমি তাহলে আসি।

বলেই হাত জুড়ে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

*　　　*　　　*

ক্লাব থেকে শাশ্বতী আজ সোজা বাড়ি ফিরে এল। বাড়ির গেট বন্ধ ছিল। বারে বারে হর্ন বাজাল শাশ্বতী। কিন্তু কেউ এসে দরজা খুলে দিল না। শাশ্বতী নিজেই গাড়ি থেকে নেমে

গেট খুলল। তারপরে গাড়ি চালিয়ে ভিতরে ঢুকেই জনকয়েক ভিখারিকে দেখতে পেল।

গাড়ি দেখে লোকগুলো সরে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, তবু শাশ্বতীকে দাঁড়াতে হল। সে এখন পোর্টিকোর দিকে যাবে না। যাবে গ্যারেজের দিকে। আর লোকগুলো সেই দিকেই সরে দাঁড়িয়েছে। গ্যারেজের দিকে যাবার পথ নেই।

বিশ্রী ভাবে হর্ন বাজাল শাশ্বতী। আর সেই শব্দ পেয়ে লতিফ ছুটে এল। তাকে দেখতে পেয়েই শাশ্বতী চেঁচিয়ে উঠল : কে ঢুকতে দিয়েছে এদের ?

লতিফ এ কথার উত্তর দিল না। লোকগুলোকে সরিয়ে গ্যারেজের দিকে যাবার পথ করে দিল। শাশ্বতী এক ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গ্যারেজের দিকে চলে গেল। লোকগুলো ভয়ে ছিটকে সরে গেল আরও দূরে।

আজ দরওয়ান কাছে নেই বলে লতিফ ছুটে গেল গাড়ির কাছে। ব্রীফ কেসটা বার করে নিয়ে গাড়ির কাঁচগুলো তুলে দিল। তারপরে শাশ্বতী বেরিয়ে আসবার পরে গ্যারেজের দরজা দিল ভেজিয়ে। তালা-চাবি দরওয়ানের কাছে। সে বোধহয় ভাবতেই পারে নি যে শাশ্বতী এই সন্ধ্যার ঝোঁকেই ফিরতে পারে।

শাশ্বতী লতিফের সঙ্গে আর কোন কথা বলল না। এগিয়ে গেল পোর্টিকোর দিকে। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। ভিখিরিদেরই একজন শুয়ে আছে বারান্দায়। একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। আর তার বাবা কাছে দাঁড়িয়ে দেখছেন ব্যাপারটা।

সকালবেলায় খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেই শাশ্বতী এই রকমের একটা ছবি দেখেছিল। কঙ্কালের মতো কয়েকটা স্ত্রী-পুরুষ ফুটপাথের উপরে শুয়ে বসে আছে। মায়ের কোলে একটা শিশু কাঁদছে বীভৎস ভাবে, আর মা তার বুকের দুধ

শুকিয়ে গেছে বলে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। গা ঘিনঘিন করেছিল শাশ্বতীর। খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এখন নিজেদের বাড়িতে সেই হতভাগাদের দেখে শাশ্বতী কী বলবে ভেবে পেল না।

ঘোষাল সাহেব একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন: লোকটা বাঁচবে তো ডাক্তার?

ডাক্তার বললেন: কোন রোগ তো দেখছি না! অনেকদিন খেতে না পেয়েই বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

অ্যাঁ! খেতে পায় নি অনেক দিন!

ডাক্তার বললেন: আমার তো তাই মনে হয়।

লতিফ, লতিফ!

বলে ঘোষাল সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন।

লতিফ ছুটে এসে বলল: হুজুর!

ঘোষাল সাহেব বললেন: ঘরে খাবার কী আছে?

ডাক্তার বললেন: আগে খাবার নয়, আগে একটু দুধ দিলে ভাল হয়।

ঘোষাল সাহেব মেয়েকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন: ওমা, একটু দেখো তো এদের।

বলে তাঁর কোটের পকেট থেকে টাকা বার করে ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে তাঁর ফী নিয়ে চলে গেলেন।

শাশ্বতী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার চলে যাবার পরে বলল: তুমি এদের বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছ বাবা?

ঘোষাল সাহেব বললেন: বাড়ির দরজায় এরা মরে পড়ে থাকবে, সেটা কি ভাল হয় মা?

শাশ্বতী বলল: এ তুমি ভাল কাজ করছ না বাবা, পরে তোমাকে পস্তাতে হবে।

ঘোষাল সাহেব এবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ

কঠিন হয়ে গেল। মনে হল যে মানুষটা বুঝি পালটে গেলেন এক মুহূর্তে। কঠিন স্বরে বলে উঠলেন: তোমার কাছে আমি উপদেশ চাই নি শাশ্বতী!

শাশ্বতী তার বাবার এ রকম কণ্ঠস্বর আগে কখনও শোনে নি। এ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠতেও দেখে নি কোন দিন। আবার তাঁর পরিশীলিত সংযমের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল না। শাশ্বতীকে হতবুদ্ধি দেখে সস্নেহে বললেন: তোমাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করে নাও। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

শাশ্বতী বুঝতে পারল যে তার বাবা একটি অপ্রীতিকর পরিবেশকে হালকা করে দেবার চেষ্টা করলেন। এবং পরক্ষণেই বুঝতে পারল যে তার কারণ ছিল। তিনি বোধ হয় হীরেনবাবুকে গেট খুলে ভিতরে ঢুকতে দেখেছিলেন। এইবারে চেঁচিয়ে উঠলেন: আরে, এসো এসো।

হীরেনবাবু প্রসন্ন মুখেই আসছিলেন। এইবারে দাড়ি দুলিয়ে বললেন: বুঝেছি বুঝেছি। এ আমার মায়ের কাণ্ড। দুদিন রিহার্শল দিতে না দিতেই মায়ের প্রাণ কেঁদেছে এদের জন্যে।

শাশ্বতীর মনে হল যে সপাং করে একখানা চাবুক যেন তার পিঠে পড়ল। কোন কথা না বলেই সে তরতর করে উপরে উঠে গেল।

নীচে দাঁড়িয়ে হীরেনবাবু বলতে লাগলেন: এতে লজ্জার কী আছে! এ সব তো মায়েদেরই কাজ!

কিন্তু এ কথা শাশ্বতীর কানে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লতিফ দুধ এনেছিল একটা গ্লাসে। তাই দেখে ঘোষাল সাহেব বললেন: খাইয়ে দাও ওকে। আর রান্না হলে ঐ হতভাগাদেরও খাইয়ে দিও। তারপর সবাইকে বার করে দিও গেটের বাইরে।

হীরেনবাবুর সঙ্গে বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন: দরওয়ানকে বলে দিও, আর যেন কেউ ঢুকতে না পারে। এ বাড়ি সরাইখানা নয়।

ঘরে এসে হীরেনবাবু বললেন: ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার আর বল কেন। আমারই গেটের সামনে এক হতভাগা খাবি খাচ্ছিল। চোখের সামনে একটা লোক মরে যাবে! দরওয়ানকে বলেছিলুম ওকে ভেতরে আনতে। বলতে না বলতেই ওই হতভাগারা ওকে ভেতরে টেনে আনল।

হীরেনবাবু আশ্চয হয়ে এই গল্প শুনছিলেন।

ঘোষাল সাহেব বললেন: অন্ধকারে ওরা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিল, তা দেখতে পাই নি। ইচ্ছে করেই ওকে এখানে এনে ফেলেছিল কি না তাও জানি নে।

হীরেনবাবু একটা গভীর বিরক্তির সুরে বললেন: যেমন দেশ, তার শাসন ব্যবস্থাও তেমনি।

ঘোষাল সাহেব বললেন: ওদের গাল দিচ্ছ কেন?

কেন দেব না? সবাইকে দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না! চারি দিকে লোক মরছে অনাহারে, জলকষ্টে, বিনে চিকিৎসায়—

ঘোষাল সাহেব আশ্চর্য হয়ে তাকালেন হীরেনবাবুর দিকে। আর তিনি বলে চললেন: কে দেখবে এ সব? কার দায়িত্ব এই দরিদ্র লোকদের খেতে পরতে দেবার, চিকিৎসা করে বাঁচাবার, লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করবার? সরকার নামের ঐ শক্তিশালী সংস্থাটা কি শাসনের নামে চিরকালই ওদের শোষণ করবে?

আজ আবার এ সব কী বলছ হীরেন? তুমিও কি নাটকের অভিনয় করছ?

অভিনয় আমি করছি, না তোমরা করছ? নিজের মনের ভেতরটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখ তো! ওদের জন্যে তোমার সত্যিকার কোন দয়া মায়া আছে, না লোক দেখাবার

জন্যে ওদের ডেকে এনেছ? পাড়ার লোক তোমার জয়জয়কার করবে। ঘোষাল সাহেব কতগুলো গরিবের প্রাণ বাঁচিয়েছে! বয়স কম হলে হয়তো খবরের কাগজের রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারদেরও খবর দিতে। তাই না?

ঘোষাল সাহেব বললেন: দাঁড়াও দাঁড়াও। ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝে নিতে দাও।

একটু থেমে প্রশ্ন করলেন: আমার সঙ্গে তোমার সরকারের সম্বন্ধটা এখন কী বল তো?

হীরেনবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন: তোমার অস্থিমজ্জার ভেতরে ঐ সরকারের রক্ত বইছে। ঐ রক্তেই তোমার চেহারাটি এখন পুষ্ট। এককালে তো তোমরাই সরকার চালিয়েছিলে! আজ অস্বীকার করলে চলবে কেন!

ঘোষাল সাহেব একটু বিরক্ত ভাবেই বললেন: অস্বীকার কে করছে।

হীরেনবাবুও উত্তপ্ত ভাবে বললেন: তোমার উত্তরাধিকারীরা। দেশের দুর্দশার জন্যে তাদের যে দায়িত্ব আছে, তা তারা ঝেড়ে অস্বীকার করছে।

করবেই।

করবেই?

ঘোষাল সাহেব এবারে শান্ত গলায় বললেন: কারণ তারা আইন প্রণয়ন করে না, তারা পলিসি ডিসিশন নেয় না, তারা শুধু হুকুম তামিল করে। তারা অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটার মাত্র।

আচ্ছা তাই মেনে চললুম। এই যে তোমার বাড়ির সামনে লোকগুলো খাবি খাচ্ছিল, তা তোমার অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটাররা আগে ভাগে বুঝে সতর্ক হয় নি কেন?

কোন ব্যবস্থা নিয়েছিল কি না তুমি জানো না।

সে ব্যবস্থা এফেকটিভ্ হয় নি কেন? সেটা কার দোষ?

ঘোষাল সাহেব হেসে বললেন: আজ কি তুমি কোন

জনসভায় ভাষণ শুনতে গিয়েছিলে? শুনতে পাই, ময়দানে মনুমেণ্টের নীচে নেতারা নাকি আজকাল এই ধরনের ভাষণ দিচ্ছেন।

নেতারা মানে?

ইলেক্‌শনে হেরে গেছেন যাঁরা, তাঁরা। যাঁরা জিতেছেন, তাঁরাও নাকি এক সময়ে এই রকম কথা বলে আক্রমণ করতেন।

হীরেনবাবু এবারে নিজের কথার খেই ধরে বললেন: আচ্ছা তুমিই বল, দেশের পরিস্থিতির সঠিক খবর আমরা কাগজে পাই না কেন? দেশের কোথায় কী দরকার। মানুষগুলো কী পেলে খেয়ে পরে বাঁচতে পারে, এ সব কথা কাগজে বেরোয় না কেন?

হীরেনবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঘোষাল সাহেব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন: অনেক বড় বড় কথা বলেছ, কিছু খাবে এখন?

হীরেনবাবু চটে উঠে বললেন: বারে বারেই তুমি আমায় সাব্‌জেক্ট্‌ থেকে ডাইভার্ট করে দেবার চেষ্টা করছ দেখছি। এ অভ্যেসটা তো তোমার ভাল নয়!

ঘোষাল সাহেব তবু বললেন: আমার জন্যে বোধহয় কফি আসছে। তুমি আমাকে কম্পানি দিলে ভাল লাগত বলেই বলছি।

লতিফ এই সময়ে একটি ট্রের উপরে দুটি পেয়ালা আনল। ট্রেতে একটি পেগ টেবলে রেখে প্রথম পেয়ালাটি নিয়ে গেল হীরেনবাবুর কাছে। ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে বললেন: এ আবার কী এনেছ?

ওভালটিন।

বলে পেয়ালাটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্য পেয়ালাটি দিল ঘোষাল সাহেবের হাতে।

হীরেনবাবু এক চুমুক ওভালটিন খেয়ে বললেন: সবাইকে শিখিয়ে রেখেছ দেখছি।

ঘোষাল সাহেব কোন কথা না বলে হাসলেন। আর আরও দু'তিন চুমুক ওভালটিন খেয়ে হীরেনবাবুও খানিকটা প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু কিছু বলবার আগেই সুজিত বাসু হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

এঁরা তার গাড়ির শব্দ পায় নি। তর্কে ডুবে গিয়েছিলেন বলেই বোধহয় কোন শব্দ কানে যায় নি। সুজিত আজ হাত বাড়িয়ে কারও সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করল না, উত্তপ্ত সুরে হীরেনবাবুকে বলল: আপনার ছাত্র—

কথাটা হীরেনবাবু শেষ করতে দিলেন না, বললেন: জানি। আমিই তাকে সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলুম।

আপনি!

হ্যাঁ আমি। আমিই তাকে বুঝিয়েছিলুম যে লাজুকের মতো সে এত দিন যা করেছে তা ভুল। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে কোন দিন ঢাকা যায় না। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে যুদ্ধ করতে হয়। আজ সে তাই করেছে তো? আমি খুশী হয়েছি।

সুজিত খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল: আমার সঙ্গে তো যুদ্ধ করে নি, সে অপমান করেছে শাশ্বতীকে।

অপমান! উহুঁ, সাত্যকি কোন মানুষকে অপমান করবে না। সব মানুষকে সে তো সমান সম্মান করে।

সুজিতের দিকে তাকিয়ে ঘোষাল সাহেব বললেন: কী হয়েছে বল তো!

সুজিত বলল: ভদ্রলোক শাশ্বতীর মুখের ওপরেই বলেছে যে তার নাটকের নায়িকা হবার যোগ্যতা তার নেই।

হীরেনবাবু বললেন: ঐ নাটকের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার যোগ্যতা কি আমার আছে?

আপনার!

বলে সুজিত আশ্চর্য হয়ে তাকাল হীরেনবাবুর দিকে।

হীরেনবাবু ধমক দিয়ে বললেনঃ সঙ্কোচ করছেন কেন। বলুন না সত্যি কথা!

তা কী করে থাকবে!

এই তো। এরই নাম হল সত্য কথা। এতে আমার অপমান হবে কেন! আর শাশ্বতীরই বা কেন অপমান হবে! সে আসুক আমার কাছে। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব মান অপমানের কথা।

তারপরে ঘোষাল সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন ঃ আমি যদি বলি শাশ্বতীর যোগ্য পাত্র হল সাত্যকি। তুমি বলবে কখনই না। আবার তুমি সুজিতকে যোগ্য পাত্র ভাবলে আমি অন্য কথা বলব। যোগ্যতার বিচার এক একজনের কাছে এক এক রকম। সেই জন্যে তার মাপকাঠিটা নিজের হাতে না রেখে কোন নিরপেক্ষর হাতে দিতে হয়। তাতেই হয় ন্যায় বিচার।

ঘোষাল সাহেব বেশ গম্ভীর হয়ে বললেনঃ তোমার মাথায় কি আজ একটু গণ্ডগোল হয়েছে হীরেন?

হীরেনবাবু এই মন্তব্যটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুজিতকে বললেনঃ আপনার হাতে ও ফাইলটা কিসের? সাত্যকির নাটকটা কি আপনি ফেরত দিতে এসেছেন?

সুজিত বলল ঃ ফেরত দিতে নয়, শাশ্বতী এটা পড়তে চেয়েছে।

পড়তে চেয়েছে!

হীরেনবাবু সত্যিই এবারে আশ্চর্য হলেন।

তাই দেখে সুজিত বলল ঃ হ্যাঁ, আজ রাতেই সে পড়ে ফেলতে চায়।

হীরেনবাবু বিড়বিড় করে বললেনঃ নায়িকা হবার অযোগ্য জেনেও সে নাটকটা পড়ে দেখতে চায়! তবে কি সে বুঝতে চায় কেন সে অযোগ্য! তারপরেই ঘোষাল সাহেবকে বললেনঃ লতিফকে বল তো, মাকে আমার খবর দেবে!

লতিফ সুজিতকে দেখতে পেয়েছিল। উপরেও গিয়েছিল শাশ্বতীকে সেই খবর দিতে। দিয়ে এসে বলল: মিসি বাবার শরীর ভাল নেই।

আই সী।

বলে সুজিত উঠে দাঁড়াল। লতিফকে বলল: এই ফাইলটা তার হাতে দিও।

তারপরে ঘোষাল সাহেবের দিকে চেয়ে বলল: গুড নাইট!

বলেই বেরিয়ে গেল।

ঘোষাল সাহেব তার গুড নাইটের জবাব দেবার সময় পেলেন না বলে গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন। আর হীরেনবাবু বেশ উৎফুল্ল ভাবে বললেন: ছেলেটা বেশ নাড়া দিয়েছে দেখছি!

কোন্ ছেলেটা?

বলে ঘোষাল সাহেব হীরেনবাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

হীরেনবাবু বললেন: কোন্ ছেলের কথা বলব আশা কর? তোমাদের ঐ সুজিতবাবু? ছ্যাঃ।

ছ্যা কেন?

চরিত্র বলে ওর কিছু আছে! থাকলে এমন করে—

সুজিতের গাড়ির শব্দ গেটের বাইরে মিলিয়ে গিয়েছিল। আর একটা হালকা শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন হীরেনবাবু। হালকা চটির শব্দ আসছিল কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে। শব্দটা উপর থেকে নীচে নেমে এল। তারপরেই শাশ্বতী এসে ঘরে ঢুকল।

হীরেনবাবু পরম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।

শাশ্বতী বলল: সাত্যকিবাবুকে একবার এ বাড়িতে আনতে পারেন জ্যাঠামশাই?

হীরেনবাবু এক মুহূর্ত স্থির হয়ে শাশ্বতীকে দেখলেন। তারপরে বললেন: এ বাড়িতে সে আসবে না।

কেন? সে কি আমাদের ঘৃণা করে?

মানুষকে সে শ্রদ্ধা করে মা, ঘৃণা কাউকে করে না।

তবে ?

সে ঘৃণা করে মানুষের বাইরের খোলসটাকে। সেই খোলসটা খসে পড়েছে দেখলেই সে আপন হয়ে যাবে। তখন সে না ডাকলেও আসবে।

শাশ্বতীর হাতে সেই ফাইলটা ছিল। 'মানুষের ক্ষুধা'র পাণ্ডুলিপি। বলল ঃ আজ আমি এটা পড়ে দেখতে চাই। তারপরে কাল তার সঙ্গে কথা বলব।

হীরেনবাবু লজ্জিত ভাবে বললেন ঃ তোমাকে সে কি অপমান করেছে মা ?

শাশ্বতী হেসে বলল ঃ না তো ! সে তার বিশ্বাসের কথা বলেছে। মিথ্যা বলে নি। যদি পারি, আমি তার কথা মিথ্যা প্রমাণ করে দেব।

হীরেনবাবুর মনে হল, এ যেন অন্য এক শাশ্বতী। সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত সত্যান্বেষী শাশ্বতী। ঘোষাল সাহেবও বোধহয় এই কথাই ভাবলেন। তাই দুজনের কেউই কিছু বলতে পারলেন না।

শাশ্বতী অল্প সময়েই নাটকটা পড়ে ফেলল। পড়তে পড়তেই লেখার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। লেখা তো নয়, যেন অন্য জগতের কথা। তার পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে কিছুই মেলে না। তার মনে হচ্ছিল সে যেন কোন বিচিত্র দেশের মানুষের কথা পড়ছে, তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা, তাদের আশা নিরাশার কথা, তাদের প্রেম ভালবাসার কথা। কত সৎ। কত সরল এই মানুষগুলি। আর কত বঞ্চিত, কত নিপীড়িত। তাদের জন্যে বেদনায় বুক মুচড়ে ওঠে। ক্ষেপে ওঠে মন। কিন্তু তারা নির্বিকার, তারা প্রতিবাদ জানাতে শেখে নি, বিদ্রোহ কথাটা শোনে নি। কাউকে অভিসম্পাত দিতেও তারা জানে না।

শাশ্বতীর মনে হল যেন সাত্যকি তার নায়কের চোখ দিয়ে দেখেছে এই মানুষগুলো। তাদের দুঃখ অনুভব করেছে নিজেদের হৃদয় দিয়ে। আর সেই অভিজ্ঞতার কথাই বিশ্বস্ত ভাবে বলেছে

নাটকের মধ্য দিয়ে। এর ভিতরে কোন ফাক নেই। কোন রকম ফাকি দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি সাত্যকি।

তারপর সে নিজের কথা ভাবল। তার তো এই জীবনের কোন অভিজ্ঞতা নেই। সে কি পারবে এই নাটকের কোন চরিত্রের রূপ দিতে? সাত্যকি মিথ্যা বলে নি। বলেছে তার আশঙ্কার কথা। অন্য কোন লেখকও ঠিক এই কথাই বলতে পারত। সাত্যকি তাকে খুশী করবার চেষ্টা করে নি, স্তোকবাক্য দিয়ে মিথ্যাকে সে প্রশ্রয় দেয় নি। সে যা, তাই সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। মনে মনে সাত্যকিকে সে ধন্যবাদ জানাল।

মাঝখানে একবার সে ডিনার খেতে নীচে নেমেছিল। লতিফ উপরে গিয়ে খবর দিয়েছিল যে সাহেব ডিনারের জন্য অপেক্ষা করছেন। শাশ্বতী তখন ভুলে গিয়েছিল খাবার কথা। লতিফের ডাকে চমকে উঠে বলেছিল: ডিনার! বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন!

হ্যাঁ, মিসিবাবা!

আমি এখুনি আসছি।

বলে শাশ্বতী সেই দৃশ্যটাও শেষ করে ফেলেছিল। তারপরে পাণ্ডুলিপি উলটে রেখে ছুটে নেমে এসেছিল।

তার পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ঘোষাল সাহেব। লিভিং রূম থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির নীচেই দেখেছিলেন মেয়েকে। প্রসন্ন তার দৃষ্টি, স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। বলল: আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করছ বাবা?

ঘোষাল সাহেব আশ্চর্য হলেন মেয়ের কথা শুনে। বড় আন্তরিক সুর, বড় ভাল লাগল মেয়ের এই উদ্বেগটুকু। বলতে পারলেন না যে রোজই এমনি করে তিনি তার অপেক্ষা করেন। তার বদলে বললেন: রাত অনেক হয়েছে বলেই খবর পাঠিয়েছিলুম।

শাশ্বতী বলল: সত্যিই আমার খুব দেরি হয়ে গেছে বাবা!

বলে তাঁর সঙ্গে এল খাবার ঘরে।

সাত্যকির লেখাটার কথা ঘোষাল সাহেব নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন না। মেয়ে সেই প্রশ্ন কী ভাবে নেবে, তা তিনি জানেন না। তাই তিনি বলার মতো কোন কথা খুঁজে পেলেন না।

কোলের উপরে ন্যাপকিন বিছিয়ে শাশ্বতী বলল : নাটকটা পড়ছিলাম বাবা।

তাই বুঝি!

বলে ঘোষাল সাহেব মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

শাশ্বতী বলল : মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক অন্য কোন দেশের কথা লিখেছেন, কোন অজ্ঞাত অপরিচিত জাতির কথা। এ দেশের মানুষের কথা বলেই মনে হচ্ছিল না।

কেন?

এ রকম মানুষ আমরা দেখি নি। এ রকম মানুষ যে আমাদের দেশে আছে, এ কথাই আমরা জানি নে।

খেতে খেতে আরও অনেক কথা বলল শাশ্বতী : মাঝে মাঝেই আমার মনে হচ্ছিল যে ভদ্রলোক বোধ হয় কল্পনা করে এই সব লিখেছেন। কিন্তু তারপরেই ভেবেছি যে কল্পনা করে কি মানুষের দুঃখ এ ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়!

ঘোষাল সাহেব বললেন : রাশিয়ার লেখক মিখাইল শলোকভের কথা শুনেছি। তিনি নাকি কসাকদের কথা লেখবার জন্যে বিশ বছর কাটিয়েছেন কসাকদের গ্রামে। তার পরে লিখেছেন 'কোয়ায়েট ফ্লোজ্ দি ডন'।

তুমি পড়েছ সে বই?

না।

শুনেছি, তার মোটা মোটা চারটে ভলুম।

শাশ্বতী বলল : আমিও পড়ি নি। অত বড় বই পড়বার ধৈর্য আমার নেই।

ঘোষাল সাহেব বললেন : যারা পড়ে, তারা কী বলে জান? বলে, ভাল বই কষ্ট করে পড়তে হয় না, বই নিজেই পড়িয়ে নেয়।

শাশ্বতী কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঘোষাল সাহেব বললেন: বুঝলে না ব্যাপারটা? যে কোন ভাল বই পড়তে আরম্ভ করলেই পাঠক তার মধ্যে এমনি ভাবে ডুবে যায় যে তার কোন খেয়ালই থাকে না। বই শেষ হবার পরে বুঝতে পারে যে সারারাত হয়তো সে জেগেই বই পড়েছে।

শাশ্বতী একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল: আমিও বোধ হয় বইএর মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। তুমি ডেকে না পাঠালে খাবার কথা মনেই পড়ত না।

ঘোষাল সাহেব বললেন: এটা কিন্তু ভাল বইএর লক্ষণ। শেষ পর্যন্ত পড়ে তোমার মতামতটা আমায় জানিও তো!

শাশ্বতী বলল: নিশ্চয়ই জানাব।

বাতি নিবিয়ে শুতে যাবার সময় শাশ্বতীর মনে হল যেন অন্য কোন জগতে সে চলে গিয়েছিল। বইখানা শেষ না হলে সে বোধহয় তার পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারত না। এখনও পুরোপুরি ফিরে আসতে পারে নি। এখনও তার হৃদয় সেই হতভাগ্যদের কাছেই পড়ে আছে।

শাশ্বতী শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার ঘুম এল না। নাটকের নায়িকা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কঠিন অভাবের সংসারে একটি কল্যাণী নারীর চরিত্র। ঘরে খাবার নেই। জীবিকার্জনের কোন পথ নেই স্বামীর। ক্ষুধায় কাঁদছে তার কোলের সন্তান। শুধু একটি গৃহের কথা নয়। সমস্ত গ্রাম হাহাকার করছে খাদ্যের জন্য। বৃষ্টি হয় নি। ফসল হয় নি। কুয়ো শুকিয়ে গেছে। জল আনতে হচ্ছে দূরের গ্রামের শুকনো নদীর বুকে বালি খুঁড়ে। এর পরে মহামারি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। এত দিন এই সংবাদ চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল সরকারী কর্মচারীরা। মুখিয়ার মুখ বন্ধ করেছে নানা প্রলোভন দেখিয়ে। বিধান সভার সদস্য এখন রাজ্যের প্রধান শহরে বাস করেন। লোক-সভার সদস্য তো দেশের রাজধানীতে। এ অঞ্চলের ধারে

কাছেও তাঁর কোন প্রতিনিধি নেই। কার কাছে যাবে অসহায় মানুষগুলো!

শেষ পর্যন্ত অনাহারে মৃত্যু শুরু হল। সেই খবর বেরুল খবরের কাগজে। সরকার পক্ষ অস্বীকার করল এই সংবাদ। কিন্তু মৃত্যু বন্ধ হল না। একটার পর আর একটা মৃত্যু। সংবাদ-পত্রের উপরে সরকারী চাপ পড়ল। আর কোন সংবাদ প্রকাশ হল না। তারপর সেই মানুষগুলো দীর্ঘ পথ হেঁটে আসতে লাগল নিকটের শহরগুলিতে। প্রধান শহরের ফুটপাথে এসে তারা বাসা বাঁধল। দুর্ভিক্ষের সংবাদ আর চাপা রাখা গেল না। সাহায্য পাঠাতে হল গ্রামে গ্রামে।

কিন্তু সেই সাহায্য কতটুকু পৌঁছল! কার কাছে পৌঁছল! আর যে সরকারি কর্মচারীরা সেই সাহায্য নিয়ে গ্রামে গঞ্জে গেল তাদের আরও বড় ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যেই যেন তারা এই সাহায্যের প্রলোভন নিয়ে গেল। নাটকের নায়িকার কাছেও পৌঁছল এই প্রলোভন। কোলের সন্তান কাঁদছে, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে অসহায় স্বামী। তাদের বাঁচাতে হলে নিজেকে রক্ষা করা যাবে না। প্রাণ যাবে না। অশুচি হবে দেহ, মৃত্যু হবে প্রেমের।

শাশ্বতী ভাবতে লাগল, এই জীবন কি সে দেখেছে, না এ জীবনের কথা কোন দিন সে শুনেছে!

শোনে নি কি!

সহসা শাশ্বতীর দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠল। শুনেছে, সেও শুনেছে এই জীবনের প্রতিধ্বনি। কিন্তু সে অন্য পরিবেশে। সভ্যতা নামের একটা খোলসের মধ্যে আবৃত দেখেছে সেই আদিম ক্ষুধা, আর তা নিবৃত্তির জন্যে প্রলোভনের কৌশল। সুজিতের চোখেও সে দেখেছে এই ক্ষুধা, আর তার প্রলোভনের কথাও মনে পড়ে গেল। প্রেম নয়। সে ছিল প্রেমের নামে খেলা। সুজিত সেই খেলা খেলেছিল তার সঙ্গে—

ইতালির ক্যাপ্রি দ্বীপে, ব্লু গোণ্ডোয়, তারপর রোমে। সুজিত হয়তো সে সব ভুলে গিয়েছিল। কলকাতায় তাকে দেখে আবার মনে পড়ে গেছে সেই পুরনো দিনের কথা। আবার তার ক্ষুধা জেগেছে, আবার সে এক নতুন প্রলোভন নিয়ে এগিয়ে এসেছে। নাটকের নায়িকা সাজিয়ে সুজিত কি সেই প্রলোভনেরই নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে না! সুজিতের সঙ্গে এই নাটকের সরকারী প্রতিনিধির কতটুকু প্রভেদ আছে। প্রভেদ আছে কি কিছু!

এই মুহূর্তে শাশ্বতীর মনে হল যে কোন প্রভেদই নেই। মানুষ নানা ভাবে তার আদিম ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করে। এক এক সমাজে তার এক এক রকমের ছল। এক এক রকমের কৌশল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে একই প্রলোভনের একটুখানি হেরফের। দাতাকর্ণবেশী সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে সুজিতের কোন পার্থক্য শাশ্বতী এখন দেখতে পাচ্ছে না।

তারপরে সে তার কর্তব্যের কথা ভাবল। অভিনয়ের এই ভূমিকা থেকে সে সরে আসবে, না প্রাণপণ চেষ্টা করে সার্থক করে তুলবে তার ভূমিকা। সরে আসতে চাইলে লোকে পরাজিত ভাববে তাকে, কিংবা সাত্যকিই জিতে যাবে তার কাছে। তাই বা সে হতে দেবে কেন! সে নিজে কেন জিততে পারবে না! চেষ্টা করে কেন সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে না! পৃথিবীতে অসম্ভব বলে তো কিছু নেই! মানুষের মনোবলটাই বড়, মনোবলের কাছে আর সব কিছুকেই একদিন হার স্বীকার করতে হবে।

শাশ্বতী স্থির করে ফেলল, এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় সে নামবে। সাত্যকিকে বুঝিয়ে দেবে, সে অযোগ্য নয়, সাত্যকি ভুল বুঝেছিল তাকে।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবলে ঘোষাল সাহেব নিজেই কথাটা তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন: নাটকটা কি পড়ে শেষ করেছ?

শাশ্বতী বলল: হ্যাঁ।

কেমন লাগল?

ভাল।

কিন্তু এ রকমের সংক্ষিপ্ত উত্তরে ঘোষাল সাহেব যেন সন্তুষ্ট হলেন না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নিঃশব্দে।

শাশ্বতী এর পরে কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু বাবা মুখের দিকে চেয়ে আছেন দেখে বলল: পড়তে পড়তে মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মনে হয়, ঐ সব মানুষদের মধ্যে আমিও একজন হয়ে গেছি।

ঘোষাল সাহেব বললেন: এ রকমের লেখা তো সচরাচর দেখতে পাই নে! প্রচুর শক্তির দরকার।

শাশ্বতী কোন প্রতিবাদ করল না।

ঘোষাল সাহেব প্রশ্ন করলেন: তুমি কী করবে স্থির করলে?

শাশ্বতী বলল: কাল ভেবেছিলাম, আমি নামব। কিন্তু এখন আবার অন্য কথা মনে হচ্ছে।

ঘোষাল সাহেব কোন প্রশ্ন করলেন না।

শাশ্বতী নিজেই বলল: কিছুতেই মন স্থির করতে পারছি না। এক পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসছি। ভয় হচ্ছে, আধখানা কাপড় পরে ঐ রকমের একটা মেয়ের পার্ট আমি বোধ হয় করতে পারব না!

ঘোষাল সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন: আধখানা কাপড়!

শাশ্বতী বলল: গোটা কাপড় তারা কোথায় পাবে!

হুঁ।

বলে ঘোষাল সাহেব নীরব হলেন।

শাশ্বতী বলল: ঠিক মতো অভিনয় করতে পারলে দর্শকেরা সত্যিই কাঁদবে।

কান্নার বই নাকি?

হ্যাঁ। তবে দুঃখের জন্য কান্না নয়। লোকে কাঁদবে মানুষদের মনুষ্যত্ব দেখে। ওরকম মানুষ আমরা শহরে দেখতে পাই নে।

ঘোষাল সাহেব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : সাত্যকি ছেলেটাকে তোমার কেমন মনে হয় ?

শাশ্বতী বলল : চেহারা দেখে তাকে অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়েছিল। কিন্তু তার লেখা পড়ে দেখছি যে গভীর তার অন্তর্দৃষ্টি, আর অত্যন্ত দরদী মন। তা না হলে মানুষকে এমন আপন করে নেওয়া সম্ভব নয়।

ঘোষাল সাহেব প্রসন্ন মুখে বললেন : হীরেন এ কথা শুনলে ভারি খুশী হবে।

শাশ্বতী বলল : তিনি নিশ্চয়ই জানেন এই কথা। তা না হলে তাকে অমন ভালবাসবেন কেন !

শাশ্বতী আজ সকালে আর কোথাও বেরোল না। একবার তার হীরেনবাবুর কাছে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। তার পরেই ভেবেছিল, না, সবার আগে তার সাত্যকির সঙ্গেই দেখা হওয়া দরকার। তার সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া করতে হবে। সত্যি সে কী চায় ! সে কি নাটকটা ফিরিয়ে নিতে চায়, না চায় তার নাটকের সার্থক অভিনয় হোক। তাকেই আগে মন স্থির করতে বলবে। শেষেরটা যদি তার অভিপ্রেত হয়, তবেই তার অভিনয় করা না করার প্রশ্ন। শাশ্বতী তার কাছে স্পষ্ট ভাবেই তার আপত্তির কারণ জানতে চাইবে। সে আপত্তি তার সামাজিক অবস্থার জন্যে হলে বলবে যে হিসেবের ভুল হচ্ছে সাত্যকির। যোগ্যতাই বড় কথা, সমাজে প্রতিষ্ঠা নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি নয়, নয় কোন ব্যক্তিগত বিচার।

সুজিত সকালে একবার টেলিফোন করেছিল। নাটকটা পড়া হয়েছে কি না জানতে চেয়েছিল। আর পড়া হয়েছে জেনেই ছুটে আসতে চেয়েছিল। শাশ্বতী বারণ করেছিল তাকে। বলেছিল : আজ আমাকে একটু ভাবতে দাও।

কিসের ভাবনা ?

অভিনয় করব কি না !

সুজিত যেন আকাশ থেকে পড়েছিল। বলেছিল: তুমি কী বলছ শাশ্বতী! এত দূর এগিয়ে কি আবার পিছিয়ে আসা যায়! তুমি ঐ পাগলটার কথায় কি নিজেও পাগলামি করবে!

শাশ্বতী অনুরোধ করেছিল: এখন একটু ভাবতে দাও সুজিত, অফিসের পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

সুজিত বলেছিল: তুমি কি অফিস থেকেও আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

একদিন না-ই বা বললে!

এক সঙ্গে লাঞ্চও খাবে না?

শাশ্বতী বলল: আজ দুপুরে আমি বাবার সঙ্গে খাব।

বলেই টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছিল।

লিভিং রুম থেকেই এই কথা হয়েছিল। ঘোষাল সাহেবও শুনেছিলেন এই কথোপকথন। খানিকটা আশ্চর্য হয়েছিলেন শাশ্বতীর কথা শুনে। অনেকদিন দুপুরে সে বাড়িতে লাঞ্চ খায় নি। লাঞ্চ সে অফিসেই খায়, কিংবা অফিস পাড়ায় তার বন্ধুর সঙ্গে। আজ হঠাৎ তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খাবার শখ কেন হল, তিনি তা বুঝতে পারলেন না। এ কি সুজিতকে এড়াবার জন্যে! কে জানে তার মনের কথা।

শাশ্বতী লতিফকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল: বাবা আজকাল লাঞ্চে বসেন কখন? দেড়টায় তো? আমি সেই সময়েই আজ এসে পড়ব। এক সঙ্গে খাব।

অফিসে যাবার আগে শাশ্বতী বলল: জ্যাঠামশাই যদি আজ আসেন বাবা, তো আমার কথা তাঁকে বোলো। তাঁর মতটাও জেনে রেখো। আমার কী করা উচিত তা তোমরা ঠিক করে দিও।

ঘোষাল সাহেব বললেন: হীরেনকে আমি জিজ্ঞেস করে আসব?

তুমি আবার কষ্ট করবে কেন?

কষ্ট আর কী! ও তো কাছেই থাকে!

তবে চল না। আমি তোমাকে তাঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে যাই!

সেই ভাল।

বলে ঘোষাল সাহেব উঠে পড়লেন।

শাশ্বতী আজ তার অফিস থেকে সোজা ক্লাবে চলে এসেছিল। সুজিতকে বলেছিল: না, রোজ রোজ তোমার এ অফিসে আসা ভালো দেখায় না।

সুজিত বলেছিল: তবে এসো, আমরা একসঙ্গে চা খাব কোন রেস্তোরাঁয়।

শাশ্বতী বলল: আজ আমার একটু তাড়া আছে।

সে কি! এর পরে হয়তো—

বাধা দিয়ে শাশ্বতী বলেছিল: পরের কথা পরেই ভাবব।

তবু সুজিত জিজ্ঞাসা করেছিল: তোমার কী হয়েছে বল তো? কাল থেকেই তোমার মেজাজটা দেখছি কী রকম বিগড়ে আছে!

তোমরাই বিগড়ে দিয়েছ।

বলে শাশ্বতী টেলিফোনের রিসিভার রেখে দিয়েছিল।

এর পরেও সুজিত আবার টেলিফোন করেছিল। শাশ্বতী বলেছিল: অফিসে তুমি আমাকে বার বার ফোন কোরো না।

সুজিত আশ্চর্য হয়ে বলেছিল: তুমি কি বলছ শাশ্বতী!

উত্তরে শাশ্বতী বলেছিল: সব সময়ে আমি একা থাকি নে। আমার সঙ্গে কখনও আমাদের ক্লায়েণ্টরা থাকেন। তাঁরা রেস্‌পেক্টেব্‌ল পার্সন। তাঁদের সামনে হালকা কথা বলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাতে আমাদের ফার্মের নাম খারাপ হয়। কখনও আমার কোলিগ্‌রা থাকেন, কখনও স্টাফ বা স্টেনোগ্রাফার। তাদের সামনে এই ধরনের হালকা কথা বলতে আমার লজ্জা করে।

সুজিত বলল: এর মধ্যে লজ্জার কী আছে! আমরা চুরি করছি নাকি!

শাশ্বতী তাকে নির্লজ্জ বলল না, বলল ঃ তোমার লজ্জা বলে কিছু নেই।

টেলিফোনে হা-হা করে হেসেছিল সুজিত। বলেছিল ঃ ঠিক চিনেছ আমাকে। আমি সত্যিই কিছু রেখে ঢেকে করতে পারি নে।

কিন্তু কর সব কিছুই।

বলে শাশ্বতী টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল।

পরক্ষণেই টেলিফোন আবার বেজে উঠেছিল। আর সুজিত উত্তপ্ত ভাবে বলেছিল ঃ এ কি, রিসিভার নামিয়ে রাখলে কেন। কাজের কথাই যে এখনও বলা হয় নি।

কাজের কথা ?

হ্যাঁ। নাটকের ম্যানস্ক্রিপ্ট্‌টা চাই যে! অনেকটা টাইপ করতে বাকি আছে।

শাশ্বতী বলেছিল ঃ তার আর দরকার হবে না।

সুজিত যেন আকাশ থেকে পড়েছিল, বলেছিল ঃ দরকার হবে না!

শাশ্বতী বলেছিল ঃ এ নাটকের অভিনয় যদি হয় তো পার্টগুলো হাতে লিখে নেওয়া হবে। তোমার টাইপের চেয়ে তা পড়তে সুবিধা হবে।

বলে আবার তার রিসিভার রেখে দিয়েছিল।

এর পরে সুজিত আর শাশ্বতীকে বিরক্ত করে নি। সাহস পায় নি তাকে বিরক্ত করবার। অফিসের বাকি সময়টা সে চুপ করে থেকে পাঁচটার ঠিক পরেই বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু শাশ্বতীর আগে ক্লাবে পৌঁছতে পারে নি।

ক্লাবে এসে শাশ্বতী দেখল যে কেউ আসে নি। শাশ্বতী নিজের ঘড়ি দেখলে। না, এখনও কারও আসবার সময় হয় নি। প্রথমে পায়চারি করল খানিকক্ষণ। সাত্যকির কলেজের ছুটি হয় কখন, তাও ভাবল। চারটের সময় নিশ্চয়ই ছুটি হয়ে যায়। তারপরে

কি ছেলেমেয়েরা কলেজে থাকে! না, প্রফেসররাই বসে থাকে শূন্য ঘরে! সাত্যকি তাহলে এতক্ষণ কী করছে!

ঘরের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতেই সে একসময় একখানা চেয়ারে বসে পড়ল। সাত্যকির পাণ্ডুলিপিটা তার হাতেই ছিল। সেটা খুলে তাড়াতাড়ি কয়েকটা পাতা উলটে গেল। এই তো—এইখান থেকেই তার পাট আরম্ভ। শাশ্বতী পড়তে লাগল। পড়তে পড়তেই ডুবে গেল সেই পড়ার মধ্যে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল চটি জুতোর শব্দ পেয়ে। ফট ফট শব্দ করে সাত্যকি ঘরে ঢুকেছিল। আর একাগ্র মনে শাশ্বতীকে পড়তে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। শাশ্বতী মুখ তুলে তাকাতেই সাত্যকি তার দু'হাত জুড়ে বলল : নমস্কার।

নমস্কার।

বলে শাশ্বতী উঠে দাঁড়াল।

সাত্যকি বলল : আমার খুব দেরি হয়ে গেল, জানেন! ভেবেছিলাম আরও আগে আসব। আপনার আসবার আগেই।

শাশ্বতী বলল : দেরি আর কোথায়! চা খেয়ে আসতে এটুকু সময় তো লাগবেই।

চা! চা আমি খাই নে তো!

চা খান না!

খাই নে তা নয়, চা খাবার অভ্যেস আমার নেই।

তারপরে হেসে বলল : আমাদের পাড়ায় তো কোন চায়ের দোকানে ঢোকবার উপায় নেই। সব ছাত্র-ছাত্রীরা বসে চা আর সিগারেট খাচ্ছে। আর এ পাড়ায় এসে চা খাব!

বলে নিজের পকেটটা দেখিয়ে হাসতে লাগল।

এই সরল হাসিটি শাশ্বতীর বেশ লাগল। বলল : তবে দেরি হল কেন?

সাত্যকি বলল : কিছুতেই বাসে উঠতে পারছিলাম না। চারটের

পরে বাসে যা ভিড় হয়! তারপরে এ পাড়াতেও তো হাঁটতে হয় অনেকখানি পথ!

শাশ্বতী বলল: আমার সঙ্গে একটুখানি আসবেন?

কোথায়?

বলে সাত্যকি ভয়ে ভয়ে তাকাল শাশ্বতীর মুখের দিকে।

শাশ্বতী হেসে বলল: ভয় পাচ্ছেন কেন! আমি কি আপনাকে কোন খারাপ জায়গায় নিয়ে যাব!

আপনি নিজে বুঝি খারাপ জায়গা জানেন!

বলে শাশ্বতীকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল সাত্যকি।

কৃষ্ণা আসছিল। সে বলল: এ কি! আপনারা চলে যাচ্ছেন!

শাশ্বতী বলল: চলে যাচ্ছি না ভাই। এ ভদ্রলোক চা না খেয়েই ছুটতে ছুটতে এসেছেন কলেজ থেকে। সুজিতরা এলে বোলো আমরা এখুনি আসছি।

বলে নিজের গাড়ির ডান দিকে সাত্যকিকে তুলে দিয়ে নিজে বাঁ দিকের স্টীয়ারিংএ বসল। বিলিতি গাড়ি। শাশ্বতী এখানা বিলেত থেকেই এনেছিল।

পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামতেই সাত্যকি ভয় পেয়ে গেল। বলল: দাঁড়ান একটু। পকেটটা দেখে নিই। মা কত দিয়েছেন আজ।

শাশ্বতী বলল: আপনাকে দেখতে হবে কেন! আমিই তো আপনাকে নিয়ে এলাম।

কিন্তু আপনি পয়সা দেবেন কেন?

সাত্যকিকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে শাশ্বতী বলল: ও সব পুরনো ধ্যান-ধারণা ভুলে যান তো! মেয়েদের মেয়ে বলে আর অবজ্ঞা করবেন না।

বলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে, গাড়ি লক করে বলল: আসুন।

শাশ্বতীর মনে পড়ল যে গতকালও সে এই রেস্তোরাঁয় এসেছিল। কিন্তু সাত্যকির বদলে সুজিত ছিল সঙ্গে। সুজিত তাকে যেন বগল দাবা করে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল, আর সাত্যকি অত্যন্ত

সঙ্কোচের সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে ভিতরে এল। একটা টেবিলে বসে শাশ্বতী চা-এর হুকুম করল, আর তারই সঙ্গে কিছু খাবারের। সাত্যকি প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্যর্থ হল।

শাশ্বতী বলল ঃ আপনার মতো ভালমানুষ নিয়ে বিপদ অনেক।

সাত্যকি এ কথার উত্তর দিল না। চারিদিকে দেখতে লাগল ছেলেমানুষের মতো। তারপরে বলল ঃ এ পাড়ায় একবার এসেছিলাম।

তাই বুঝি!

হুঁ। তখন কলেজে পড়ি। গৌতম ছিল বড়লোকের ছেলে. তারই সঙ্গে এসেছিলাম। কিন্তু আমার ভাল লাগে নি, জানেন!

শাশ্বতী বলল ঃ আপনার মা তখনও আপনাকে গুনে গুনে পয়সা দিতেন?

সাত্যকি বলে উঠল ঃ কিন্তু কোন দিন কম পড়ে না, জানেন!

বেশি পয়সা দিলে কম পড়বে কেন!

বেশি পয়সা মা কোথায় পাবে! আমরা দুটি মানুষ বলেই তো চলে।

শুধু দুটি মানুষ!

হুঁ! আমার আর ভাই-বোন নেই।

সাত্যকি যে বিয়ে করে নি শাশ্বতী তা বুঝল। বলল ঃ বিয়ে করেন নি বুঝি?

বিয়ে!

বলেই সাত্যকি হাসতে লাগল। সেই সরল মিষ্টি হাসি, কতকটা শিশুর মতো সরল।

শাশ্বতী একটু লজ্জিত হয়ে বলল ঃ হাসছেন কেন?

সাত্যকি বলল ঃ মাস্টারমশাইও সেদিন এই কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। বিয়ে করে বউকে খাওয়াব কী?

শুধু খাওয়াবার জন্যেই বিয়ে নাকি!

আগে তো খাওয়ানোর ভাবনা। তারপরে অন্য ভাবনা।

আর সে সব মেটাতে না পারলেই অশান্তি। তার চেয়ে এ বেশ আছি। সংসারের সব ভাবনা মার। আর আমাকে দেখুন না, কেমন আপনার সঙ্গে—

বলেই থেমে গেল।

শাশ্বতী একটু অপেক্ষা করে বলল: আপনি বেশ সেকেলে আছেন।

কেন বলুন তো!

পৃথিবীটা যে অনেক এগিয়ে গেছে, এ খবর আপনি রাখেন না।

সাত্যকি তার বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে ধরল শাশ্বতীর মুখের উপর।

শাশ্বতী বলল: এ কালের বউয়েরা কি সব সময় বোঝা হয়ে থাকে নাকি! বউয়েরা রোজগার করে না?

সাত্যকি বলল: বেশ বলেছেন! বিয়ে করে বউকে রোজগার করতে বলব!

তা বলবেন কেন? একটা রোজগেরে মেয়ে বিয়ে করবেন!

সাত্যকি বলল: সে রকম মেয়ে আমার মত একটা গরিব মাস্টারকে বিয়ে করবে কেন?

শাশ্বতী হাসল। বলল: সুজিতকে দেখেছেন তো! সেও তো একটা রোজগেরে বউয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

সাত্যকি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

তাই দেখে শাশ্বতী বলল: কী হল?

সাত্যকি বলল: আপনাদের নিয়ে—

কিন্তু তার কথাটা শেষ হবার আগেই শাশ্বতী কঠিন ভাবে বলল: কেন, আমরা একসঙ্গে ক্লাবে আসি বলে? আজ যখন আপনার সঙ্গে যাব, তখন কি আপনার সম্বন্ধেও সেই রকম কথা বলবে?

সাত্যকি ছেলেমানুষের মতো হেসে বলল: আমার সঙ্গে মিশে আপনার তো কোন লাভ হবে না!

শাশ্বতী বলে উঠল: এ সব কথা আপনি বুঝবেন না, বোঝবার ক্ষমতা নেই আপনার।

চা আর খাবার এসেছিল। চা ঢেলে সাত্যকিকে এগিয়ে দিয়ে শাশ্বতী বলল: কৃষ্ণাকে দেখেছেন ?

দেখেছি।

কেমন দেখলেন তাকে ?

মনে হয় খুব দুঃখী মেয়ে। আচ্ছা, সুজিত বাসুর সঙ্গে কি তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল ?

শাশ্বতী গভীর দৃষ্টিতে তাকাল সাত্যকির দিকে। তারপরে আস্তে আস্তে বলল: আপনাকে সে কিছু বলেছে ?

নিজের কথা কি কেউ বলে ?

তবে ?

মানুষের বেদনা যে বোঝা যায় !

বোঝা যায় ?

যায় বইকি।

শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করল: আমার কি কোন বেদনা আছে মনে করেন ?

সাত্যকি বলল: আমি আপনার কতটুকু জানি !

কৃষ্ণারও তো কিছু জানেন না !

সাত্যকি স্থির হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল: আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

বলুন না।

আপনি যা খুঁজছেন, তা পাচ্ছেন না। মন আপনার ভারি অশান্ত।

অন্যমনস্ক ভাবে শাশ্বতী বলল: আমি কী খুঁজছি বলে আপনার মনে হয় ?

সাত্যকি আর কোন দ্বিধা না করে বলল: জীবনে যার সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। যা পেলে সব পেয়েছি বলে সবার মনে হয়।

শাশ্বতীর দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হয়ে এল। মুখ নামিয়ে সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

সাত্যকি বলল : জীবনে অনেক কিছু পেয়েও মনে আপনার তাই কোন শান্তি নেই।

শাশ্বতী অনেকক্ষণ কথা বলল না।

অপরাধীর মতো সাত্যকি বলল : আপনি কি রাগ করলেন ?

না।

তবে আর কথা বলছেন না কেন ?

শাশ্বতী আস্তে আস্তে বলল : আমি কৃষ্ণার কথা ভাবছি।

আপনার নিজের কথা নয় ?

না। সুজিতকে ভালবাসে কৃষ্ণা। আর সুজিতও ওকে বিয়ে করত। কিন্তু—

সাত্যকি এর পরের কথা শোনবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল। তারপরে বলল : কিন্তু কী ?

আমি ওদের মাঝখানে এসে গেছি। আমার জন্যেই ওর অশান্তি। কিন্তু সুজিত এ কথা কিছুতেই বুঝবে না।

সাত্যকি চুপ করে রইল।

কিন্তু শাশ্বতী নীরবে থাকতে পারল না। বলল : বছর তিনেক আগে সুজিতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তারপরে সে আমাকে ভুলেই গিয়েছিল। সম্প্রতি আমাকে দেখে আবার ক্ষেপে উঠেছে।

তারপরেই শাশ্বতী অনুরোধ করল : আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন ?

সাত্যকি ভয় পেয়ে গেল। কোন রকমে বলল : আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি ?

শাশ্বতী বলল : আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনাকে সামনে রেখেই সুজিতকে আমি ফিরিয়ে দেব।

সাত্যকি কোন উত্তর দিতে পারল না।

ফেরার পথে শাশ্বতী বলল : আমি আপনার নাটকটা পড়েছি।

পড়েছেন ! ভাল লাগে নি বুঝি ?

কেমন লেগেছে, শাশ্বতী সে কথা বলতে পারল না। বলল: আমার অভিনয় দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন।

আপনি অভিনয় করবেন?

উৎসাহিত হয়েছিল সাত্যকি, পরমুহূর্তেই লজ্জিত ভাবে বলল: আমি আমার পুরনো কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

কেন বলুন তো?

মানুষের বাইরেটা দেখে ভেতরটা চেনা যায় না।

এখন চিনেছেন বুঝি?

বলে শাশ্বতী চকিতে সাত্যকিকে একবার দেখে নিল।

সাত্যকি বলল: পুরোপুরি চেনা কি যায়! মানুষ নিজেকেই ভাল করে চেনে না।

বলে হাসতে লাগল। সেই রকমের সরল হাসি।

শাশ্বতীর মনে হল যে এই লোকটা বোধ হয় তার হাসির মতোই সরল। তাই আবার জিজ্ঞাসা করল: আর কোন আপত্তির কারণ নেই তো?

সাত্যকির হঠাৎ কৃষ্ণার একটা কথা মনে পড়ে গেল। রিহার্সলের খরচের কথা। এই রকমের খরচ করলে শেষ পর্যন্ত হয়তো দুর্গতদের কোন সাহায্যই দেওয়া যাবে না। তাই বলল: আমাদের উদ্দেশ্যটা যাতে সার্থক হয়? সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

কোন্ উদ্দেশ্য?

আমরা যেন মোটা টাকা তুলতে পারি। আর তার থেকে—

খরচ করা যাবে না। এই তো! আমি সে দায়িত্ব নেব।

সাত্যকি খুশী হয়ে বলল: তাহলে আর কোন ভাবনা নেই।

রিহার্সলের ঘরে সুজিত ছটফট করছিল। কৃষ্ণাকেই সে দোষী সাব্যস্ত করেছে। বলল: তুমি তাদের আটকালে না কেন?

বা রে, আমি আটকাতে যাব কেন?

তুমি যখন দেখলে যে তারা আমার আগে এসে পড়েছে, তখন তাদের একটু অপেক্ষা করতে বললেই পারতে।

কৃষ্ণা কঠিন ভাবে বলল: সুজিত, এ ব্যাপারে তোমার ইন্টারেস্ট থাকতে পারে, আমার নেই। কে এল, আর কে গেল, এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন!

বেশ কথা। আরে, এখানে কি চায়ের ব্যবস্থা হতে পারত না! চা কি এখানে আমরা খাইনে যে কেউ চা খেয়ে আসে নি বলেই বাইরে যেতে হবে!

সুজিত গজগজ করতে লাগল। বলল: এক দিন রাস্তার জ্যামে আটকে গেলেই দেখি, এই রকমের একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়!

কৃষ্ণা বলল: দুর্ঘটনা কিছুই ঘটে নি। তুমি যে কাল অনেক দেরি করে এলে, তাকে আমরা কেউ দুর্ঘটনা বলি নি। শেষ পর্যন্ত তুমি যে এসেছিলে তাতেই আমরা সবাই কৃতার্থ বোধ করেছিলাম। আর শাশ্বতী যখন তোমাকে ফেলে চলে গেল, তখন আমরা বেশ খুশীই হয়েছিলাম।

তা হবে বইকি!

আজও বেশ খুশী হয়েছি আমি। শাশ্বতী যদি সাত্যকির গলা ধরে ঝুলে পড়ে তাহলে আরও খুশী হই।

কী বলছ তুমি!

কৃষ্ণা বলল: ঠিকই বলছি! তুমি যা পেরেছ, সেও তো তা পারে। আর তা যদি সে করে তো তোমার আপসোস করার কিছু নেই।

নন্‌সেন্স্‌!

বলে হাতের সিগারেটটা সুজিত ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কৃষ্ণা হেসে বলল: তোমার সিগারেটটা কোন দোষ করে নি। ওটাকে তুমি শুধু শুধু ছুঁড়ে ফেলে দিলে। যে দোষ করেছে ভাবছ, তাকে এমনি ভাবে ছুঁড়ে ফেলতে পারলে তোমাকে বাহাদুর বলব।

সুজিত এ কথার উত্তর দেবার সময় পেল না। রিহার্সলের জন্যে আরও দু'তিনজন এসে উপস্থিত হল। তাদের সামনে সুজিত আর কোন কথা বলার চেষ্টা করল না। তাদের পুরনো সম্পর্কটা অনেকেই জানে। আর শাশ্বতীর সঙ্গে এই নতুন ঘনিষ্ঠতা অনেকের চোখেই বিসদৃশ ঠেকছে।

সুজিতকে একজন জিজ্ঞাসা করল : আজ থেকে রিহার্সল আরম্ভ হচ্ছে তো?

সুজিত বলল : কিন্তু বিপদটা দেখুন না! কাল শাশ্বতী নাটকের ম্যানুস্ক্রিপ্ট চেয়ে নিল। আর আজ এখনও পর্যন্ত তার দেখা নেই।

কৃষ্ণা বলল : শাশ্বতী সাত্যকিবাবুকে নিয়ে চা খেতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে। বলেই তো গেছে! অমন ব্যস্ত হলে চলবে কেন!

সত্যি নাকি!

বলে আর একজন ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করল। কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

সুজিত বলল : একটার পর একটা দিন নষ্ট হচ্ছে। রিহার্সলের প্রগ্রেস দেখে একটা টেন্‌টেটিভ ডেট স্থির করতে পারলাম না। এ রকম দেরি হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ব্যাপারটার আর কোন ইম্পর্টান্সই থাকবে না।

কৃষ্ণা বলল : তোমার কাছে টাইপ করা কপি তো সব আছে! রিহার্সল আরম্ভ করে দাও না। প্রথমেই তো তোমার হিরোইনের দরকার নেই!

ঠিকই তো।

বলে সবাই নিজের নিজের কাগজ বার করে ফেলল।

কিন্তু এই রিহার্সল পরিচালনা করবে কে, তা স্থির হয় নি। কৃষ্ণা সুজিতের দিকে তাকিয়ে বলল : বল কী করতে হবে।

আমি বলব!

কৃষ্ণা কঠিন স্বরে বলল : তুমি ছাড়া আর কে বলবে!

তোমাকেই তো লিডিং রোল নিতে হবে! কাকে কী পার্ট দেবে, কার ওপরে কোন্ দায়িত্ব দেবে, এ সব তো তুমি বলবে।

সুজিত বেশ বিব্রত বোধ করল।

কিন্তু কৃষ্ণা থামল না। বলল: নায়িকার জন্যে উতলা হলেই তো চলবে না! তুমি নিজে ডাইরেকশন দেবে, না আর কারও ওপরে এই ভার দেবে সেই কথা বল।

সুজিত অসহায় ভাবে তাকাল অন্যান্য সদস্যদের দিকে।

আর ঠিক এই সময়েই সাত্যকির সঙ্গে শাশ্বতী এসে ঘরে ঢুকল। কৃষ্ণার কথা বোধহয় শাশ্বতী শুনতে পেয়েছিল, বলল: সাত্যকিবাবুর ডাইরেকশনেই অভিনয় হবে।

একজন বলে উঠল: খুব ভাল কথা। লেখক যদি নিজে ডাইরেক্টর হয় তো তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।

সুজিত ফোস করে উঠেছিল। কিন্তু কিছু বলার সুযোগ পেল না।

শাশ্বতী বলল: আমার মনে হয়, পুরো নাটকটা আজ সবার শোনা উচিত। চরিত্রগুলো জেনে নিজে পছন্দ করে পার্ট নিলে বোধহয় সবারই সুবিধে হবে, অভিনয়ও ভাল হবে। তাই না সাত্যকিবাবু?

তাহলে তো খুবই ভাল হয়।

বলে সাত্যকি সমর্থন করল শাশ্বতীকে।

শাশ্বতী বলল: কারও যদি আপত্তি না থাকে তো আমি নাটকটি পড়তে পারি। আমার একবার পড়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি পড়তে পারব। ঘণ্টা খানেকের মতো সময় লাগবে পড়তে। আর স্টেজে সময় লাগবে দু'ঘণ্টার মতো।

নাটকের পাণ্ডুলিপিটা তারই হাতে ছিল। সবার সম্মতি পেয়ে সে ধীরে ধীরে পড়তে লাগল। কখন যে তার গলার স্বর ভারি হয়ে এসেছিল, তা সে বুঝতে পারে নি। এক সময়ে তার গলা ধরে এল, চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার পড়তে লাগল।

শাশ্বতী যে এমন দরদ দিয়ে তার নাটক পড়তে পারবে, সাত্যকি এ কথা ভাবতেও পারে নি। তার ইচ্ছে হয়েছিল যে পড়া শেষ হলে সে তার পড়ার প্রশংসা করবে। কিন্তু সে কথা শেষ পর্যন্ত সে বেমালুম ভুলে গেল। চোখের চশমাটি খুলে নিজের চোখই সে রুমাল দিয়ে মুছতে লাগল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

খানিকক্ষণ পরে শাশ্বতীই প্রথম কথা কইল। বলল ঃ আমার মনে হয় না যে পার্ট লিখে বিলি করবার খুব দরকার আছে। প্রম্প্‌টার তো থাকবেই, আমি কাল একজন প্রম্প্‌টারের ব্যবস্থা করব। তাহলে কারও কোন অসুবিধা হবে না। আর সুজিত!

বলে শাশ্বতী সুজিতের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ এখন থেকে খরচপত্রের হিসেব আমিই রাখব। আর এই রিহার্সলে যা খরচ হবে, বা যা হয়েছে, তা আমাদের ব্যক্তিগত খরচ। শো-তে যে টাকা উঠবে, তার পাই পয়সাটি পর্যন্ত যাবে রিলিফ ফাণ্ডে। আর এই টাকা আমরা এমন একজনের হাতে তুলে দেব যে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

তারপরে বুঝিয়ে বলল ঃ সাত্যকিবাবুর ইচ্ছা আমাদের এই সমবেত চেষ্টার সবটুকু ফল যেন দুঃস্থদের হাতে পৌঁছয়। তাদের একটুখানি হাসি যেন আমরা নিজেদের চোখে দেখতে পাই।

একজন বলল ঃ খুব ভাল আইডিয়া।

আর একজন বলল ঃ এর জন্যে আমরা নিজেরাই কোন গ্রাম বেছে নেব।

শাশ্বতী বলল ঃ নিজেরা বেছে নিলে হয়তো বিরূপ সমালোচনা হতে পারে। তাই আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব দিতে পারি যে কোন একটা গ্রামের ভার আমাদের ওপরে দেওয়া হোক। সেই গ্রামের দুর্দশা মোচনের দায়িত্ব থাকবে আমাদের ওপর।

শাশ্বতীর মুখের দিকে চেয়ে রইল সাত্যকি। কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। ভারী আশ্চর্য লাগছিল এই মেয়েটাকে।

আর ভাবছিল কাল সে কী ভুলই করেছিল। শাশ্বতীকে বাদ দিলে তো সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যেত।

ঘরের এক পাশে গম্ভীর মুখে বসেছিল সুজিত। কৃষ্ণা তার দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল। সুজিত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল: আজ তাহলে ছুটি!

ছুটির কথা এতক্ষণে সবার মনে পড়ল। কিন্তু শাশ্বতী বলল: আমার ছুটি হবে সাত্যকিবাবুকে বাড়ি পৌঁছবার পরে। আসুন সাত্যকিবাবু!

বলে সাত্যকিকে ডেকে নিয়ে সবার সামনে দিয়ে শাশ্বতী বেরিয়ে গেল।

ঘরের বাইরে এসে সাত্যকি বলল: এ আপনি কী করলেন?

কেন, কোন দোষ করেছি?

দোষের কথা নয়। আমি সুজিতবাবুর কথা ভাবছিলাম। তিনি কী ভাবলেন!

শাশ্বতী কঠিন সুরে বলল: সুজিত তো আমার গার্জিয়ান নয়। ও যদি কিছু বলতে আসত তো ওকেও এই উত্তরই দিতাম। আর ও তা জানে বলেই কিছু বলে নি।

বলে নিজের গাড়ির দরজা খুলে সাত্যকিকে আগে তুলে দিল। তারপরে নিজে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ক্লাবের কম্পাউণ্ড থেকে বেরোবার আগেই শাশ্বতী প্রশ্ন করল: আপনি কোন্ অঞ্চলে যাবেন?

ভবানীপুরে। কিন্তু আমাকে আপনি—

পথে কোথাও নামিয়ে দেব, এই তো! সে ভাবনা আমাকে ভাবতে দিন না!

সাত্যকি কোন প্রতিবাদ করবার সাহস পেল না, নিঃশব্দে বসে রইল শাশ্বতীর পাশে।

এক সময়ে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করল: বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মায়ের কাছে খুব বকুনি খান তো!

আপনাকে কে বলল ?

শাশ্বতী সকৌতুকে বলল ঃ জ্যাঠামশাই।

সাত্যকি নির্বিবাদে এই কথা বিশ্বাস করে বলল ঃ সে দিন হঠাৎ মাস্টারমশাই এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। আমার এক ছাত্র জোর করে আটকে রেখেছিল। সেই সুযোগে মা আমার সম্বন্ধে অনেক নালিশ করেছিলেন।

তারপরেই প্রশ্ন করল ঃ আর কী বলেছিলেন বলুন তো!

শাশ্বতী গম্ভীর ভাবে বলল ঃ আপনার একটা বিয়ে দেবার কথা।

সাত্যকি তখনই বলে উঠল ঃ তাই মাস্টারমশায়ের মাথায় এই কথা ঢুকেছে।

তারপরেই বলল ঃ আপনি আমার একটু উপকার করবেন ?

কী উপকার ?

মাস্টার মশাইকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে এ নিয়ে যেন আর মাথা না ঘামান।

কেন ?

আমার এই মাইনেয় যে বিয়ে করা কোন মতেই উচিত নয়, তা মাস্টারমশাইকে আপনি বোঝালেই বুঝবেন।

আর আপনি বোঝালে ?

ওরে বাবা! 'তুমি কী বোঝ' বলে এক ধমকে থামিয়ে দেবেন আমাকে।

শাশ্বতী হেসে বলল ঃ সবাই আপনাকে বকেন বুঝি!

ভালবাসেন অনেক বেশি।

বলেই বুঝতে পারল যে শাশ্বতী তার সঙ্গে এতক্ষণ পরিহাস করছিল। তাই তখনই লজ্জিত ভাবে বলে উঠল ঃ আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে তামাশা করছেন!

শাশ্বতী একথার উত্তর না দিয়ে বলল ঃ এবারে কোন্ দিকে যাব বলুন।

এই দিকে।

তার কিছুক্ষণ পরে বলল: এবারে ঐ দিকে।

এমনি করে এক জায়গায় এসে সাত্যকি বলল: এইখানেই নামিয়ে দিন।

এটাই কি আপনার বাড়ি?

না। এই পাশের রাস্তায়।

গাড়ি যায় না?

যায়।

তবে?

বলে শাশ্বতী সেই রাস্তার ভিতরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল।

সাত্যকি বলল: আমার জন্যে আপনি শুধু শুধু কষ্ট করছেন!

শাশ্বতী বলল: অন্য দিন আপনাকে কি এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট করতে হয় না।

আমার অভ্যেস আছে!

শাশ্বতী বলল: গাড়ি চালানোর অভ্যেস কি আমার নেই?

ঠিক এই সময়েই সাত্যকি বলে উঠল: এই—এই বাড়িটা আমাদের।

বলতেই শাশ্বতী বাড়ির দরজা ঘেঁষে গাড়ি থামাল।

সাত্যকি পথে নেমে শাশ্বতীকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছিল। শাশ্বতীও নেমে পড়ে বলল: ও কি, রাস্তা থেকেই আপনি আমাকে বিদেয় করবেন নাকি!

সাত্যকি বলল: আপনি আসবেন ভেতরে! মা তাহলে ভীষণ খুশী হবেন।

বলেই দরজার কড়া নাড়ল, আর চেঁচিয়ে বলল: আমি কড়া নাড়ছি মা।

শাশ্বতী কোন কথা না বলে সাত্যকির পিছনে এসে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত পরেই বাড়ির দরজা খুলে গেল। সাত্যকির মা হাসি মুখে বললেন: আয়।

তারপরেই পিছনে শাশ্বতীকে দেখে থমকে গেলেন।

সাত্যকি বলল: আমার নাটকের নায়িকা আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছে মা।

আর শাশ্বতী বলল: আমার নাম শাশ্বতী।

এসো এসো।

বলে সাত্যকির মা তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে গেলেন।

বসবার ঘরে এসে শাশ্বতী দেখল যে পুরনো আমলের বাড়ি। বড় বড় ঘর। দরজা জানালাও বড় বড়। ঘরের আসবাবপত্রও পুরনো আমলের। কিন্তু সবই যত্ন করে সাজানো, পরিষ্কার ঝকঝক করছে চারদিক, কোথাও ধুলোবালির চিহ্ন নেই। দেওয়ালের গায়ে একখানা যামিনী রায়ের আঁকা ছবি।

সাত্যকির মা বললেন: তোমাদের ক্ষিধে পেয়েছে তো খুব?

ক্ষিধে!

বলেই সাত্যকি হাসল, তারপরে বলল: একটুও না।

মা অবাক্ হয়ে বললেন: সে কি!

সাত্যকি বলল: মিস ঘোষাল আজ আমাকে অনেক কিছু খাইয়েছেন।

কোথায়? তোমাদের বাড়িতে নাকি?

বলে শাশ্বতীর দিকে তাকালেন।

শাশ্বতী বলল: উনি কি আমাদের বাড়ি যাবেন!

কিন্তু ও তো বাইরে কোথাও যায় না!

তাই নাকি!

সাত্যকির মা বললেন: এবারে তাহলে তোমরা দুজনেই আমার কাছে খাও।

বলে তিনি ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

শাশ্বতী প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেল না। বলল: আজ না খেলে হত না! আমার যে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে!

সে কথা আপনিই মাকে বলে আসুন।

কিন্তু শাশ্বতী ভিতরে গেল না। বাইরেই ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগল। বলল: আপনার পড়ার ঘর বুঝি অন্য দিকে?

বলে পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

বাধা দিয়ে সাত্যকি বলল: না না, ও দিকে যাবেন না।

কেন?

বড় বড় মাকড়শা আছে ঐ ঘরে। আর ধুলো বালি।

দেখি তো।

বলে শাশ্বতী সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর আশ্চর্য হয়ে গেল চারদিকে চেয়ে। ঘরের চারদিকে ঘিরে বই, টেবল চেয়ারে বই, মেঝের উপরে বই, অসংখ্য বই অবিন্যস্ত ভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

অস্ফুট স্বরে শাশ্বতী বলে উঠল: এ আপনি করেছেন কী!

বলে বইপত্র সরাবার জন্যেই বোধহয় এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছন থেকে সাত্যকির মা বলে উঠলেন: ওর বইএ হাত দিয়ো না মা, ও তাহলে মারতে উঠবে।

আশ্চর্য হয়ে শাশ্বতী ফিরে এল।

আসুন আসুন, এই ঘরে এসে বসুন।

বলে সাত্যকি তাকে বসবার ঘরে আবার ফিরিয়ে আনল!

শাশ্বতী সাত্যকির মাকে বলল: আমার জন্যে আপনি কষ্ট করছেন কেন!

সাত্যকির মা হেসে বললেন: ছেলেমেয়ের জন্যে কিছু করতে কি কষ্ট হয়! তোমরা এ কালের ছেলেমেয়ে কিনা, তাই এ রকম ভাবো। অথচ আমরা একে সৌভাগ্য মনে করি। নিজে রেঁধে সবাইকে খাওয়াচ্ছি, এ কত আনন্দের ব্যাপার বল। আর এই বোকা ছেলে আমাকে দুবেলা ভয় দেখাচ্ছে, রান্নার লোক রাখবে। রান্নার লোক রাখলে আমি করব কী?

তাই বলে—

তোকে আর কথা বলতে হবে না।

বলে এক ধমকে মা ছেলেকে থামিয়ে দিলেন। তারপরে শাশ্বতীকে বললেনঃ তুমিই বল মা, রাঁধতে কি মেয়েদের কষ্ট হয়! আর এ কালের ব্যবস্থায় রান্না তো একটা শখের ব্যাপার!

আহারের পরে সাত্যকির মা বললেনঃ তুই ওকে পৌঁছে দিয়ে আয়। এত রাতে একা যাওয়া ওর উচিত হবে না।

এ কথা শুনতে পেয়ে শাশ্বতী বললঃ তার কোন দরকার নেই।

কেন?

বলে সাত্যকির মা তার মুখের দিকে তাকালেন।

সত্যি কথা বলতে শাশ্বতীর লজ্জা হল। এর চেয়ে অনেক বেশি রাতে যে সে চলাফেরা করে, তা বলতে পারল না। বললঃ কাজে কর্মে অনেক দিন তো আমার দেরি হয়ে যায়! আপনি ভাববেন না কিছু।

বলে সাত্যকিকে সে বাড়ির সামনেই বিদায় দিল। আর একা ফেরার পথে ভাবল নানা রকম কথা। এ রকম একটা সুখী সংসারের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। নিজের মাকে সে এমন শৈশবে হারিয়েছে যে তাঁর মুখখানাও এখন মনে পড়ে না। বাবা তাকে মানুষ করেছেন। আর হোস্টেলেই তার বেশির ভাগ জীবন কেটেছে। তার অনেক বন্ধু আছে, মেয়ে ও ছেলে বন্ধু। বাবাও তার বন্ধু। কিন্তু আজ মনে হল যে এত দিন তার কোন আত্মীয় ছিল না, যারা এত অল্প সময়ে এমন আপন করে নিতে পারে। সাত্যকি তার স্বভাবটি কি মায়ের কাছে পেয়েছে!

সাত্যকির আর একটি কথা তার মনে পড়ে গেল। বিকেলে চা খেতে খেতে সে বলেছিল, শাশ্বতী যা খুঁজছে তা সে পাচ্ছে না। সে খুঁজছে জীবনে যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যা পেলে সব পেয়েছি বলে সবার মনে হয়। সে জিনিস কী, শাশ্বতী তা জানতে চাইবার সাহস পায় নি। সাত্যকি এমন

কিছু বললে ভেবেছিল যে লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। অথচ এতে লজ্জার যে কী আছে, সাত্যকি তা বুঝতেই পারবে না।

শাশ্বতীর মনে হল যে সাত্যকি তার মনটাকে দেখতে পেয়েছে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ভাবে। ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা। মানুষের ভালোবাসা পাবার জন্যে শাশ্বতীর মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার সমাজে এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না যে ভালোবাসতে জানে, ভালোবাসতে চায় নিঃস্বার্থ ভাবে। সুজিতের লোভ সে জানে, আরও অনেকের মধ্যে সে এই লোভ দেখেছে।

শাশ্বতী আজ বারে বারে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। তাই খুব সতর্ক ভাবে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

ঘোষাল সাহেব সবে তাঁর ডিনার শেষ করে লিভিং রুমে এসে বসেছিলেন। মেয়ে আজ অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগে ফিরে এসেছে দেখে খুশী হয়ে উঠলেন।

শাশ্বতী হাসি মুখে তাঁর কাছে এসে বলল: সাত্যকিবাবুর বাড়িতে খেয়ে এলাম বাবা, ওঁর মা কিছুতেই ছাড়লেন না।

ঘোষাল সাহেব সস্নেহে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন: খুব ভাল করেছ।

আজ তার বাবাকে শাশ্বতীর আত্মীয় বলে মনে হচ্ছে।

দেখতে দেখতে অভিনয়ের দিন এসে গেল।

সুজিত অনেকটা পিছিয়ে গেছে। যতটুকু না করলে নয়, ততটুকুই করছে। টিকিট বিক্রির ভার তার উপর। কিন্তু কৃষ্ণা এ কাজে তার চেয়ে বেশি খাটছে। সব বিষয়ে সাহায্য করছে সুজিতকে।

শাশ্বতী তার অফিস থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়েছে। কাউণ্টারে টিকিট বিক্রির ব্যাপারে পাব্‌লিসিটি করেছে, বিনে পয়সায় প্রেসের

সাহায্য নিয়েছে নানা ভাবে। তার বিজ্ঞাপনের প্রতিষ্ঠান ঃ অনেকেই তাকে চেনে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে। সাত্যকি সম্পাদনা করে একখানা সুভেনির বার করেছে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিয়েছে শাশ্বতী।

ঘোষাল সাহেব আজকাল মেয়ের কাছেই সব খবর পান।

সকালে বাড়িতে বসে সে পার্ট মুখস্থ করত। দুপুরে খেতে আসত বাবার সঙ্গে, বিকেলে একটু আগে বেরিয়ে সাত্যকিকে তার কলেজ থেকে তুলে আনত। চা খাবার জন্যে তারা কোন রেস্তোরাঁয় বসত না। সাত্যকির তাতে মহা আপত্তি। পয়সা থাকলেই তা অপচয়ের অধিকার কারও নেই।

শাশ্বতী তার বাবার কাছে টিকিট বিক্রি করেছে। করেছে তার জ্যাঠামশাই হীরেনবাবুর কাছে। অভিনয় দেখতে যাবার জন্যে তাঁদের অনেকবার অনুরোধ করেছে। সাত্যকির মা ছেলের কাছে টিকিট কিনেছেন, রাজী হয়েছেন হীরেনবাবুর সঙ্গে অভিনয় দেখতে যেতে।

সকাল বেলায় শাশ্বতী সবাইকে জানিয়ে গেছে যে কারও কোন চিন্তা নেই, সে নিজে সবাইকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে।

দৃঢ় ভাবে সাত্যকি প্রতিবাদ করেছে ঃ অসম্ভব। নাটকে তার ইম্পর্ট্যান্ট্ রোল, অতি পরিশ্রম তার সইবে না। সে ট্যাক্সি করে সবাইকে নিয়ে যাবে। গোলমাল দেখে ঘোষাল সাহেব তাঁর পুরনো ড্রাইভারকে ডেকে আনালেন : সে আজ সময় মতো সবাইকে পৌঁছবে।

ব্যবস্থা মতো ড্রাইভার সাত্যকি আর তার মাকে তুলে এনে দেখল যে হীরেনবাবু বাড়ি নেই। হারাধন খবর দিল যে তিনি অনেক আগেই বেরিয়ে গেছেন। সাত্যকির মাকে ঘোষাল সাহেবের কাছে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার শাশ্বতী আর সাত্যকিকে রঙ্গমঞ্চে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল। আর সবাইকে নিয়ে সে সময় মতো যাবে।

ঘোষাল সাহেব বললেন: আর একবার হীরেনের খোঁজ নিতে হবে। তার শখেই তো এই নাটকের অভিনয় হচ্ছে!

সাত্যকির মা বললেন: মাস্টারমশাই আমার ছেলেকে খুব ভালবাসেন।

ঘোষাল সাহেব বললেন: আমার মেয়েকেও।

তারপরেই বললেন: মা-মরা মেয়ে তো! কাজেই অনেক অবহেলায় মানুষ হয়েছে। সংসারের কিছুই সে শেখে নি। ভারি অসুবিধে হবে এই মেয়ের বিয়ে দিতে।

সাত্যকির মা বললেন: বিয়ের আগে মেয়েরা এই রকমই থাকে। কাজকর্ম শিখে কোন্ মেয়ে আর শ্বশুরবাড়ি যায়! ঠেকেই তারা সব কিছু শেখে।

তবু মায়ের কাছে মানুষ হলে মেয়ে অন্য রকম হত। আর বয়েস তো হয়েছে, তাই ঠিক মতো মানিয়ে নিতে পারবে কি না ভয় পাই।

এ আপনার মিথ্যে ভয়। মেয়ে বড় হয়েছে বলেই তো মানিয়ে নেবার ব্যাপারটা আরও ভাল করে বুঝবে।

ঘোষাল সাহেব হার স্বীকার করে বললেন: আপনারাই এ বিষয়ে ভাল বোঝেন।

ঠিক এই সময়েই টেলিফোন বেজে উঠল। শাশ্বতী টেলিফোনে বলল: আর বেশি দেরি কোরো না বাবা, প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে। দেরিতে এলে কষ্ট পাবে।

ঘোষাল সাহেব বললেন: আমরা তাহলে এখুনি বেরিয়ে পড়ছি।

শাশ্বতী বলল: সেই ভাল। আমি তাহলে বাইরে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।

ঘোষাল সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন: চলুন তাহলে।

সাত্যকির মা মনে করিয়ে দিলেন: মাস্টারমশাইকে তো একবার দেখে যেতে হবে!

নিশ্চয়ই।

বলে ঘোষাল সাহেব এই নির্দেশ দিলেন ড্রাইভারকে।

কিন্তু হীরেনবাবুকে এবারেও বাড়িতে পাওয়া গেল না। তিনি তখনও ফেরেন নি।

ঘোষাল সাহেব বিরক্ত ভাবে বললেন: কী রকম বেয়াক্কেলে লোক বুঝি না! সময় মতো কিছুতেই তাকে পাওয়া যাবে না।

সাত্যকির মা বললেন: বেশি উৎসাহে বোধহয় আগেই বেরিয়ে পড়েছেন।

তাহলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

শাশ্বতী রঙ্গমঞ্চের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। তার পাশে ছিল সাত্যকি। দুজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করল: জ্যাঠামশাই এলেন না?

ঘোষাল সাহেব বললেন: সে এখানে আসে নি?

সাত্যকি বলল: এখনও আসেন নি তো! এলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম। ভিড়ের মধ্যেও আমি তাঁকে চিনতে পারি।

দুজনকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিয়ে সাত্যকি বলল: এই পাশের চেয়ারখানা মাস্টারমশায়ের।

আর শাশ্বতী বলল: এবারে আমরা আসি বাবা। শো'র পরে তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো না, সময় মতো ফিরে যেও।

ওরা চলে যাবার পরে ঘোষাল সাহেব বললেন: মুখের রঙ-চঙ তুলতে ওদের বোধহয় দেরি হবে।

সাত্যকির মা বললেন: সেই জন্যেই আমাদের আগে চলে যেতে বলল।

কিন্তু অভিনয় আরম্ভ হলে দেখা গেল যে কারও মুখেই রঙ-চঙ নেই। জাঁক-জমক-ওয়ালা পোশাকও পরে নি কেউ। জনকয়েক পাড়াগাঁয়ের মেয়ে পুরুষ অভিনয় করতে নামল, আর দু'তিন জন শহরের মানুষ। সবারই পোশাক নিতান্ত সাধারণ।

অল্পক্ষণ পরেই শাশ্বতীকে দেখা গেল। শতছিন্ন কাপড়, তাতে তালি দেওয়া। আধখানা কাপড় সে পরে নি। একটা জামা পরেছে গায়ে। কিন্তু সেটাও ছেঁড়া। সাত্যকিকেও চিনতে পারা গেল। সে একফালি কাপড় পরেছে। তার কাঁধে একখানা গামছা। কোন জামা গায়ে নেই।

ঘোষাল সাহেব উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন: এই রকম জামা কাপড় পরে নেমেছে। নাটক জমবে তো!

সাত্যকির মা চিন্তিত ভাবে বললেন: সত্যিই তো!

ঘোষাল সাহেব হীরেনবাবুর শূন্য চেয়ারখানার দিকে চেয়ে বললেন: ওরা ঠিকই বলেছিল। একটু নাচ গান বা ঐ ধরনের কিছু না পেলে কি লোকে পছন্দ করবে!

সাত্যকির মা বললেন: ভয়েরই কথা।

ঘোষাল সাহেব এবারে জিজ্ঞাসা করলেন: গল্পটা আপনি জানেন তো?

সাত্যকির মা বললেন: আপনি বলুন না আমাকে।

কী মুশকিল!

বলে ঘোষাল সাহেব একটু থেমে বললেন: শাশ্বতীকে জিজ্ঞেস করলেই সে বলত।

তারপরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে পাশের দর্শকরা তাঁদের কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছে। তাই আর কোন কথা বললেন না।

একটা দুর্ভিক্ষের দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য শেষ হতে না হতেই সবার মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কারও আর কোন প্রশ্ন করার অবকাশ রইল না।

একটির পর একটি দৃশ্যের অভিনয় হতে লাগল, আর দর্শকরা স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগল। যারা অভিনয় করছে তাদের জামা-কাপড়ের কথা সবাই ভুলে গেল, ভুলে গেল নাচ-গানের কথা। গ্রামের ঐ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোর জন্যে সবার মন বেদনার্ত হয়ে উঠল।

আরও কিছুক্ষণ পরে দর্শকের মনে সেই মৌলিক প্রশ্ন জাগল— এর কি কোন প্রতিকার নেই? অসহায় মানুষ কি তার ভাগ্যের কাছে এই ভাবে আত্মসমর্পণ করবে? কেন করবে? কারা এর জন্যে দায়ী? ওরা কাউকে দায়ী করতে জানে না বলেই কি কেউ দায়ী নয়! কেউ শাস্তি পাবে না ওদের এই দুর্দশার জন্যে! ঈশ্বর কি চোখ বুজেই থাকবেন!

সাত্যকির মা এক সময়ে তাঁর চোখে আঁচল চাপা দিলেন। ঘোষাল সাহেবেরও কিছুক্ষণ থেকে গলার মধ্যে একটা কষ্ট হচ্ছিল। গলায় দু'একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। কিন্তু ভিতরের কষ্ট তাতে দূর হয় নি।

শাশ্বতীকে তিনি চিনতে পারছিলেন না। ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁর মেয়ে স্টেজে অভিনয় করছে। কী অসহায় ঐ মেয়েটি! কী নিরুপায়! আর ঐ লোকটা! ঐ কি সাত্যকি! ও কেন মুখ ঢেকে বসে আছে! আর বাচ্চা ছেলেটার কান্না যে থামছেই না! শাশ্বতী ওর কান্না থামাবে কী করে! ঘরে যে কিছুই নেই!

আশেপাশে আরও কয়েকজন উসখুস করছিল। পাশের এক ভদ্রলোক বারে বারে চোখ মুছছে কেন! ওরা তো অভিনয় দেখছে! ও তো সত্যি নয়! তবে কেন সবাই এমন উতলা হয়ে পড়েছে!

ঘোষাল সাহেবের গালের উপরে সুড়সুড় করছিল। হাত বুলিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে কি জল পড়ছে! সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, এ কী করছে ওরা! অভিনয় করতে এসে কি ওরা সত্যি মানুষ হয়ে গেল!

তারপর এক সময়ে দু'ধারের পর্দা এসে মাঝখানে জুড়ে গেল! স্তব্ধ হয়ে রইল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ। কারও মুখে একটা কথা নেই। এর পরে কী হবে তাও জানা নেই কারও। শুধু মস্ত বড় একটা প্রশ্ন জেগে রইল দু'মুঠো অন্নের জন্যে কি মনুষ্যত্ব বিক্রি করতে হবে! কেউ কি উত্তর দেবে এই প্রশ্নের? আবার কি যবনিকা উঠবে? এক জন আর এক জনের দিকে তাকাল, সে তাকাল আর

এক জনের দিকে। কিন্তু কী হবে তা কেউই জানে না। অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে রইল সবাই।

এই সময়েই পর্দার আড়াল থেকে কেউ ঘোষণা করল: নাটক শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা উঠবেন না। যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। এঁদের মধ্যে নাট্যকার নিজেও আছেন। আর একটি বিশেষ ঘোষণাও আছে, সেটিও শুনবেন।

তারপরেই পর্দা সরে গেল। যাঁরা অভিনয় করলেন, তাঁদের সবাইকে অভিনয়ের সাজেই দেখা গেল। মাঝখানে সাত্যকি, শাশ্বতী তার পাশে। আড়ালে থেকে একজন পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল।

সাত্যকির মা হঠাৎ বলে উঠলেন: পেছনে মাস্টারমশাই না?

সেই রকমই তো দেখছি!

বলে ঘোষাল সাহেব সোজা হয়ে বসলেন, বললেন: ওর পাশের ঐ বিদেশীটিকেও যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!

পরিচয় শেষ হবার পরে এই বিদেশী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন: আমার নাম ভরোশিকফ। আমার দেশের এক প্রকাশক এই নাটকের রুশী অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি চেয়েছে। আর তার জন্যে লেখককে টোকেন রয়ালটি পাঠিয়েছে এক হাজার রুব্‌ল। কিন্তু লেখক এই সম্মান দক্ষিণা গ্রহণে রাজী নন। বলছেন, তিনি পয়সা রোজগার করবেন বলে মানুষের দুঃখের কথা লেখেন নি, এই টাকায় তাদের দুঃখ কিছু লাঘব হলেই তিনি তাঁর শ্রম সার্থক মনে করবেন। আমরা তাই এই টাকা তাঁর শিক্ষক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিচ্ছি। এই টাকা দুর্গতদের কাছেই পৌঁছে দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে।

হীরেনবাবু এগিয়ে এসে চেকখানি গ্রহণ করলেন। জয়ধ্বনি উঠল দর্শকদের মধ্যে। তারপরেই যবনিকা পড়ল।

শাশ্বতীকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সুজিত ছুটে এল একখানা ফুলের মালা হাতে। সেখানা তার গলায় পরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই শাশ্বতী বাধা দিয়ে বলল: এ মালা তো আমার প্রাপ্য নয়, এ মালা যার প্রাপ্য তারই গলায় দাও।

বলে সাত্যকি ভট্টাচার্যকে দেখাতে গিয়ে দেখল সে নেই। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সাত্যকি!

একে একে সবাই চলে গেল। কিন্তু শাশ্বতী যেতে পারল না। কোথায় গেল সাত্যকি! তাকে না বলেই সে চলে গেল!

সহসা তার মনে হল, অন্ধকারে আচ্ছন্ন স্টেজের উপরে একটা রুদ্ধ কান্নার শব্দ স্পন্দিত হয়ে উঠল। শাশ্বতী এগিয়ে গেল সেই শব্দ অনুসরণ করে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা লোক বসে আছে স্টেজের উপরে। একফালি কাপড় তার পরনে, খালি গায়ের উপরে একখানা গামছা। লোকটা কি ফুঁপিয়ে কাঁদছে? কে ঐ লোকটা?

কে?

বলে শাশ্বতী তার কাছে ছুটে গেল।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল মানুষটা। শাশ্বতী আশ্চর্য হয়ে দেখল, সাত্যকির দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে।

তুমি কাঁদছ?

আমি মিথ্যে কথা বলেছি শাশ্বতী। সবাইকে আমি—না না, মিথ্যে নয়, আমি সত্য কথা গোপন করেছি। আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ, তাই সাহস করে সত্য কথা বলতে পারি নি।

শাশ্বতী তার সামনে বসে পড়ল।

সাত্যকি বলল: আমার নায়িকা তার সন্তানের মুখে অন্ন দেবার জন্য বিক্রি করেছিল তার মনুষ্যত্ব। তারপর সেই আধখানা শাড়ি গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছিল। স্বামীকে সে তার মুখ দেখাতে পারে নি। এই সত্য কথা আমি কেন লিখতে পারলাম না? কেন একটা প্রশ্ন রেখে দিলাম সবার সামনে?

শাশ্বতীর দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল ঃ তোমার অন্য রকম বিশ্বাস। তোমার মন এই সত্য ঘটনা বিশ্বাস করে নি।

সাত্যকি ছেলেমানুষের মতো সরল দৃষ্টিতে তাকাল শাশ্বতীর মুখের দিকে।

শাশ্বতী বলল ঃ তুমি আজও বিশ্বাস কর যে মানুষ তার মনুষ্যত্ব কোন দিন হারায় না, হারাতে পারে না। তোমার নায়িকা আত্মহত্যা করেই তোমাকে জানিয়ে গেছে যে সে একটা ভুল করেছিল, সাময়িক দুর্বলতার জন্যে একটা মস্ত বড় ভুল। তাই তার প্রায়শ্চিত্তও সে করে গেছে। তোমার বিশ্বাসকে সে মরতে দেয় নি। ওঠো, সোজা হয়ে দাঁড়াও। এই নাও তোমার জয়ের মালা।

বলে সুজিতের সেই ফুলের মালা শাশ্বতী সাত্যকির গলায় পরিয়ে দিল।

সাত্যকি সবিস্ময়ে তাকাল চারিদিকে। না, এখন আর তারা অভিনয় করছে না।

যবনিকা